গণদাবী

সোস্যালিস্ট ইউনিটি সেন্টার অফ ইন্ডিয়া (কমিউনিস্ট)-এর বাংলা মুখপত্র (সাপ্তাহিক)

৭১ বর্ষ ২৩ সংখ্যা | ১৮ - ২৪ জানুয়ারি ২০১৯ | প্রধান সম্পাদক ঃ রণজিৎ ধর | www.ganadabi.com | আট পাতা | মূল্য ঃ ২ টাকা

মহান লেনিনের শিক্ষা

জন্ম ঃ ২২ এপ্রিল ১৮৭০
মৃত্যু ঃ ২১ জানুয়ারি ১৯২৪

"... দ্বিধাহীন কেন্দ্রীকরণ ও প্রলেতারিয়েতের কঠোরতম শৃঙ্খলাই বুর্জোয়ার ওপর বিজয়ের অন্যতম মূল শর্ত।"

"... প্রলেতারিয়েতের বিপ্লবী পার্টির শৃঙ্খলা টিকে থাকে কীসে? তার যাচাই হয় কীসে? কীসে তা সংহত হয়? প্রথমত, প্রলেতারীয় অগ্রবাহিনীর সচেতনতা, তার বিপ্লবনিষ্ঠা, তার সহ্যশক্তি, আত্মত্যাগ ও বীরত্বে। দ্বিতীয়ত, সর্বাগ্রে প্রলেতারীয় এবং সেইসঙ্গে অ-প্রলেতারীয় মেহনতি জনের ব্যাপক অংশের সঙ্গেও যোগস্থাপনের, ঘনিষ্ঠতার এবং কিছুটা পরিমাণে, বলা যেতে পারে, মিশে যেতে পারার নৈপুণ্যে। তৃতীয়ত, এই অগ্রবাহিনী যে রাজনৈতিক নেতৃত্ব দিচ্ছে তার সঠিকতায়, তার রাজনৈতিক রণনীতি ও রণকৌশলের সঠিকতায় — এবং ব্যাপকতম জনগণ তাদের নিজস্ব অভিজ্ঞতা থেকেই যেন সে সঠিকতায় নিঃসন্দেহ হয়। বিপ্লবী যে পার্টি সত্যসত্যই বুর্জোয়ার উচ্ছেদ ও সমস্ত সমাজের রূপান্তর ঘটাতে কৃতসংকল্প, এক অগ্রণী শ্রেণির পার্টি হতে সমর্থ, সে পার্টিতে এই শর্তগুলো ছাড়া শৃঙ্খলা কার্যকরী করা অসম্ভব। এই শর্তগুলো ছাড়া শৃঙ্খলা গড়ে তোলার চেষ্টা অবধারিত রূপেই পরিণত হয় ফাঁকা কথায়, বুলিতে, তামাশায়। আবার অন্য দিকে এ শর্তগুলো সঙ্গে সঙ্গেই দেখা দেয় না। সেটা দেখা দেয় দীর্ঘ মেহনত ও দুঃসহ অভিজ্ঞতা থেকে। তা গড়ে তোলা সহজ হয় সঠিক বিপ্লবী তত্ত্ব থাকলে, যে তত্ত্বটা আবার আপ্তবাক্য নয়, বরং সত্যসত্যই চূড়ান্ত রূপ পায় কেবল গণআন্দোলন ও সত্যিকারের বিপ্লবী আন্দোলনের ব্যবহারিক ক্রিয়াকলাপের ঘনিষ্ঠ সাযুজ্যে।"

(লেফট উইং কমিউনিজম অ্যান ইনফ্যান্টাইল ডিজঅর্ডার)

সব দল ব্যস্ত ভোটের হিসাবে, এসইউসিআই(সি) আন্দোলনে

৩০ জানুয়ারি মহামিছিলে যোগ দিন

ভোটের গন্ধ পেয়েই ভোটবাজ দলগুলির তরজা জমে উঠেছে। এ জোট না ও জোট, তাই নিয়ে কতই তোড়জোড়। একের পর এক ব্রিগেড সমাবেশের ডাকে সরগরম পশ্চিমবঙ্গ। কার মিটিংয়ে কোন শিবিরের কত হেভিওয়েট নেতার আবির্ভাব ঘটবে তা নিয়ে জোর চর্চা সংবাদমাধ্যমে। অথচ মূল্যবৃদ্ধি, বেকারির ধাক্কায় রাজ্যের নিতান্ত সাধারণ খেটে-খাওয়া, ছা-পোষা মানুষের যে নাভিশ্বাস ওঠার জোগাড়। শীতের সকালেও বাজারে সবজিতে-মাছে হাত দিলে যে আগুন দামের ছ্যাঁকা লাগছে তা নিয়ে হুঁশ নেই এই রঙ-বেরঙের হেভিওয়েট নেতাদের! মানুষ চাইছে তাদের জীবনের এইসব জ্বলন্ত সমস্যাগুলির সমাধান, সে সমাধান কি কোনও দলকে নিছক ভোটে জিতিয়ে আসবে? মানুষের জীবনের অভিজ্ঞতা বলছে গত সত্তর বছরে অনেক ভোট হয়েছে, নানা রঙের নানা সরকার এসেছে, তাদের জীবনের সমস্যার সমাধান হয়নি। তাই মানুষের দাবিগুলি নিয়ে উঠে এসেছে গণ-আন্দোলনের ডাক। যে ডাক দিয়েছে আন্দোলনের শক্তি এস ইউ সি আই (সি)। এই ডাকে সারা দিয়ে ৩০ জানুয়ারি মহামিছিলে সামিল হবেন রাজ্যের লক্ষাধিক খেটে খাওয়া মানুষ।

বিজেপি সরকারের আচ্ছে দিনের কারবার এমন চলেছে তাতে আম্বানি-আদানি-টাটা-বিড়লাদের হাতে শোষিত হতে হতে ছিবড়ে হয়ে যাওয়া দেশের মানুষের ক্রয়ক্ষমতা একেবারে তলানিতে ঠেকেছে। যার জেরে কমেছে শিল্প-কলকারখানার উৎপাদন। এমনিতেই তা কমছিল, এবারে বিগত ১৭ মাসের কমার হারের থেকেও নিচে নেমে গেছে তা। এর ফলটা যে কী, তা হাড়ে হাড়ে বোঝেন এ দেশের শ্রমজীবী

ছয়ের পাতায় দেখুন

মহামিছিলের প্রচার। বহরমপুর

চাকরিই নেই
কাদের জন্য, কীসের সংরক্ষণ

কেন্দ্রীয় সরকারের বর্তমান মেয়াদ যখন শেষ হতে চলেছে, সাড়ে চার বছর কেটে গেছে, তখন বিজেপি নেতারা হঠাৎ উচ্চবর্ণের পিছিয়ে পড়া মানুষদের শিক্ষা এবং চাকরির ক্ষেত্রে ১০ শতাংশ সংরক্ষণের জন্য একটি বিল শীত অধিবেশনের একেবারে শেষ অংশে তড়িঘড়ি নিয়ে এসে সংখ্যাগরিষ্ঠতার জোরে পাশ করিয়ে নিলেন।

আইনটি আনতে কেন তাঁদের এত তড়িঘড়ি? এমন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে একটি বিল অধিবেশনের একেবারে শেষ সময়ে এসে পেশ করলেন কেন? কেন এ নিয়ে সাংসদদের বিস্তৃত আলোচনা করতে দেওয়া হল না? যদি দেশের মানুষকে এটা বিশ্বাস করতে হয় যে, তাঁরা উচ্চবর্ণের পিছিয়ে পড়া মানুষদের দুরবস্থায় অতিমাত্রায় কাতর হয়ে পড়েছেন, তবে সরকারে এসেই এই আইন নিয়ে এলেন না কেন? এই কাতরতা সত্য হলে অন্তত কর্মসূচি হিসাবেও তো তাঁরা এটা ঘোষণা করতেন! বাস্তবে বিজেপির রাজনীতিতে জনগণের জন্য কাতরতার কোনও জায়গা নেই। বুঝতে অসুবিধা হয় না, লোকসভা নির্বাচনে ক্ষমতায় ফিরে আসার মরিয়া চেষ্টায় বিজেপি নেতারা আরও একবার সেই ধোঁকাবাজির রাস্তাই ধরলেন।

এই সংরক্ষণের দ্বারা আদৌ কি কোনও সুবিধা হতে পারে উচ্চবর্ণের পিছিয়ে পড়া মানুষদের? এর দ্বারা চাকরি জুটবে তাঁদের? বাস্তবে দেশে চাকরি কোথায় যে দেবেন বিজেপি সরকারের নেতা-মন্ত্রীরা! আর যা নেই তার দশ শতাংশ কি একশো শতাংশ, তাতে কী যায় আসে? সংরক্ষণ করে দিলেই যদি চাকরি হত তবে গত সত্তর বছর ধরে যাঁরা সংরক্ষণের আওতায় রয়েছেন সমাজের সেই সবচেয়ে পিছিয়ে পড়া মানুষেরা তো চাকরি পেতেন! তাঁদের মধ্যে মুষ্টিমেয় কিছু জন ছাড়া অধিকাংশের কী কাজ জুটেছে? আজও তো তাঁরা নিচের তলাতেই পড়ে আছেন! আজও তো তারা দলিত হিসাবেই থেকে গেছেন! সামাজিক-অর্থনৈতিক বিষয়গুলি নিয়ে সর্বশেষ জনগণনায় দেখা যাচ্ছে, একজন সদস্য সরকারি চাকরি করে এমন এসসি-এসটি পরিবারের সংখ্যা দেশে মাত্র ৪ শতাংশ এবং এমন ওবিসি পরিবারের সংখ্যা মাত্র ১২ শতাংশ। এই উদাহরণই তো স্পষ্ট প্রমাণ করে দেয়— আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থার পরিবর্তন না ঘটিয়ে শুধুমাত্র সংরক্ষণের দ্বারা কোনও পিছিয়ে পড়া অংশেরই যথার্থ উন্নয়ন ঘটতে পারে না।

দুয়ের পাতায় দেখুন

খেতমজুরদের মজুরি বাড়ল ২ টাকা, সাংসদদের ৫০ হাজার

এ বছর দেশের ১০টা রাজ্যে ১০০ দিনের কাজের মজুরি বাড়েনি এক টাকাও। পাঁচ রাজ্যে বেড়েছে দৈনিক মাত্র দু'টাকা। আর এই বছরেই 'গরিব' সাংসদদের মাইনে ৫০ হাজার টাকা থেকে বাড়িয়ে এক ধাক্কায় এক লক্ষ টাকা করা হয়েছে। বাজারদর বেড়ে যাওয়ায় ওই টাকায় তাঁরা নাকি কুলিয়ে উঠতে পারছিলেন না, তাই মাইনে দ্বিগুণ করা হয়েছে! যদিও এই সাংসদদের ৫৪১ জনের মধ্যে ৪৪২ জনই কোটিপতি। শুধু তাই নয়, এই কোটিপতিরাই নাকি সংসদে দেশভরা গরিব-গুর্বোদের প্রতিনিধি!

যে বাজারদর হিসাব করে সাংসদদের বেতন বৃদ্ধি করা হয়েছে, সেই বাজারদর অনুযায়ী খেতমজুরের দৈনিক মজুরি অন্তত ছশো টাকায় দাঁড়ায়। কিন্তু সেটাও দিতে নারাজ কেন্দ্র বা রাজ্য সরকার। তবে কি সরকারি দৃষ্টিভঙ্গিতে খেতমজুররা দারুণ ধনী!

খেতমজুরদের জন্য কেন্দ্রীয় সরকার বাজারদরের আলাদা সূচক (কনজিউমার প্রাইস ইন্ডেক্স ফর এগ্রিকালচারাল লেবার) তৈরি করেছে। কংগ্রেস আমলে তৈরি হওয়া এই সূচক ধরে বিজেপি সরকার মজুরি নির্ধারণ করেছে। যদিও এর মধ্যেও গরমিল রয়েছে। ১০০ দিনের কাজের মজুরি নির্ধারণ করা হয় শিক্ষা-স্বাস্থ্য-পরিবহণ-বিনোদন ও অন্যান্য নানা বিষয় ধরে, যা রাজ্য সরকারগুলি ঠিক করে। সেই হিসাবে মজুরির অঙ্ক বৃদ্ধি হওয়ার

চারের পাতায় দেখুন

ভুয়ো সংঘর্ষের তদন্তে বিজেপির এত ভয় কেন

ভুয়ো সংঘর্ষে হত্যা করেছে গুজরাটের বিজেপি সরকারের পুলিশ। দেখিয়ে দিয়েছে সুপ্রিম কোর্টে পেশ করা বিচারপতি বেদি কমিটির রিপোর্ট। এই রিপোর্টকে আটকাতে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল কেন্দ্রের বিজেপি সরকার।

ময়নাতদন্ত বলছে সোহরাবুদ্দিন সেখ এবং তাঁর স্ত্রীকে গুলি করে খুন করা হয়েছিল। খুন হয়েছিলেন তঁদের সঙ্গী তুলসীরাম প্রজাপতিও। কিন্তু কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা সিবিআই সেই খুনিকে খুঁজেই পেল না! তারা কোনও রকম সাক্ষ্য প্রমাণ হাজির করতে না পারায় অবশেষে অভিযুক্ত সকলেই বেকসুর খালাস পেয়ে গেল। নিহত সোহরাবুদ্দিনের পরিবারের কাছে ক্ষমা চেয়েছেন বিচারপতি শর্মা। বিচারকের এই অসহায়তাই বলে দেয় বিজেপির গণতন্ত্রের স্বরূপ কী। বিজেপি ক্ষমতায় আসার পর থেকে গুজরাটে ২০০২ সালে তাদের অপকীর্তি ঢাকার যে চেষ্টা সিবিআই সহ কেন্দ্রীয় তদন্ত সংস্থাগুলি করে চলেছে তার নির্লজ্জ উদাহরণ এই ঘটনা। ২০১৪ তে বিজেপি কেন্দ্রে সরকারে বসতেই এই মামলায় অভিযুক্ত গুজরাটের তৎকালীন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ সহ ১৬ জনকে সিবিআই বেকসুর রেহাই দেয়। ২০০২-২০০৬ সালে গুজরাটে মোদি জমানায় এরকম সাজানো খুনের ঘটনা ঘটেছিল অজস্র। যেখানে সংখ্যালঘু মুসলিম সম্প্রদায়ের যুবক-যুবতীদের টার্গেট করে পুলিশ ঠাণ্ডা মাথায় খুন করেছে। প্রতিটি ক্ষেত্রেই তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির পুলিশের অভিযোগ ছিল নিহতরা সন্ত্রাসবাদী এবং তারা নাকি মোদিকে হত্যার ছক কষেছিল। যদিও একটি ক্ষেত্রেও নিহতদের অপরাধ প্রমাণ করতে পারেনি সিবিআই।

কংগ্রেস আমলেই '৮০-র দশকে পাঞ্জাবে, আসামে, মহারাষ্ট্র সহ উত্তর-পশ্চিম ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে এনকাউন্টার পুলিশের কাছে প্রায় জলভাত হয়ে দাঁড়ায়। 'ফার্স্টপোস্ট' নামে একটি সংবাদসংস্থার আর টি আই-এর উত্তরে জাতীয় মানবাধিকার কমিশন জানায় ২০০০ থেকে ২০১৭-য় ১,৭৮২টি ভুয়ো সংঘর্ষের ঘটনা নথিভুক্ত হয়। উত্তরপ্রদেশে সর্বাধিক হত্যাকাণ্ডের ঘটনা ঘটে। বর্তমানে যোগী আদিত্যনাথ সরকারের আমলে পুলিশ শুধু ভুয়ো সংঘর্ষ ঘটাচ্ছে তাই নয়, মুখ্যমন্ত্রী নিজে এ কথা বুক বাজিয়ে ঘোষণা করছেন। শাসক দলের প্রয়োজনে যেমন পুলিশ এই ভুয়ো সংঘর্ষ ঘটায়, তেমনই পুলিশ অফিসাররাও ঘুষ, প্রচার ও পদোন্নতির মতো ব্যক্তিগত স্বার্থে ভুয়ো সংঘর্ষের মাধ্যমে হত্যা করে। গুজরাট-উত্তরপ্রদেশ-হরিয়ানার মতো রাজ্যে সন্ত্রাসবাদী তৎপরতার সাজানো অভিযোগে বেশির ভাগ ক্ষেত্রে সংখ্যালঘু জনগণকে টার্গেট করা হয় এমন অভিযোগকে সমর্থন করছে সরকারি এবং আন্তর্জাতিক রিপোর্টও। দিন কয়েক আগেই দিল্লি-উত্তরপ্রদেশে অস্ত্রশস্ত্র সহ বেশ কিছু স্থানীয় দুষ্কৃতীকে ধরে পুলিশ। সন্ত্রাসবাদী চক্র ধরার রোহমর্ষক গল্প সাজানো হয়। পরে জানা যায়, রকেট লঞ্চার দূরে থাক, ছিল কিছু ট্রাক্টরের ভাঙা অংশ ও কিছু দেশি বন্দুক। অর্থাৎ এ ক্ষেত্রেও সন্ত্রাসের অভিযোগ সাজানো। যে কোনও ফোন-কম্পিউটারে আড়ি পাতার অবাধ অধিকার পুলিশের হাতে তুলে দেওয়ার অজুহাত তৈরি করতেই এই রকম সাজানো 'সন্ত্রাসবাদী' আবিষ্কার বলেই সন্দেহ মানুষের।

বলা বাহুল্য টাডা, পোটা, ইউ এ পি এ-র মতো কালা আইনগুলি পুলিশকে অগণতান্ত্রিকভাবে কিছু ক্ষমতা দিয়ে রেখেছে। কংগ্রেস আমলেই যে আইনগুলি বলবৎ হয়েছিল এখন বিজেপি তাকে ব্যবহার করছে।

ভুয়ো সংঘর্ষে সরকার যে কতটা দোষী তা বোঝা যায়, এই বিষয়ে বিচার বিভাগীয় তদন্ত রিপোর্ট আটকানোর জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের ঝাঁপিয়ে পড়ার মধ্য দিয়ে। ২০০২-২০০৬-এর মধ্যে গুজরাটে এ রকমই আরও ২২টি ভুয়ো তথা সাজানো সংঘর্ষ নিয়ে সিবিআই অথবা সিট তদন্তের আর্জি জানিয়ে ২০০৭-এ সুপ্রিম কোর্টে জনস্বার্থ মামলা করেন প্রবীণ সাংবাদিক বিজি ভার্গিস ও গীতিকার জাভেদ আখতার। তারই প্রেক্ষিতে সুপ্রিম কোর্টের গড়ে দেওয়া বিচারবিভাগীয় কমিটি ২০১৮-র গোড়ায় তদন্ত রিপোর্ট জমা দেয়। সেই তদন্তের রিপোর্ট প্রকাশের দাবিতে সম্প্রতি আদালতের দ্বারস্থ হন উক্ত মামলাকারীদ্বয়ের আইনজীবীরা। সঙ্গে সঙ্গে সেই তদন্ত রিপোর্ট আটকাতে প্রায় ঝাঁপিয়ে পড়েছেন কেন্দ্রের সলিসিটর জেনারেল ও মোদি জমানার গুজরাট সরকারের আইনজীবী তুষার মেহতা। অর্থাৎ সরকারই মেনে নিচ্ছে, তারা ইচ্ছামতো খুন করেছে সংঘর্ষের নামে।

ভুয়ো সংঘর্ষের জন্য দোষী নেতা-মন্ত্রী ও পুলিশ অফিসারদের আড়াল করতে সরকারি তৎপরতা দেখে বোঝা যায় ষড়যন্ত্রের জাল কতটা গভীর ও ব্যাপক। অবশ্য এমন আশঙ্কা অমূলক নয় যে, এরপর শোনা যাবে সিবিআই তদন্তে দেখা গেছে মোদির শাসনাধীনে গুজরাটে আদৌ কোনও ভুয়ো সংঘর্ষের ঘটনা ঘটেইনি। এ দেশে ক্রমশ তাৎপর্য হারাচ্ছে 'প্রশাসনিক নিরপেক্ষতা', 'আইন ও ন্যায়ের শাসনে'র মতো গালভরা কথাগুলি। সোহরাবুদ্দিন খুনের মামলার বিচারপতি শর্মাকে এ দেশে অসহায়ত্বের কথা বলে আফশোস করতে হয়, রহস্যজনকভাবে খুন হতে হয় এই খুনের মামলার আরেক বিচারপতি লোয়াকে। বুঝতে অসুবিধা হয় না, গণতন্ত্র-ন্যায়বিচার এসবই আজ প্রহসন মাত্র।

কাদের জন্য, কীসের সংরক্ষণ

একের পাতার পর

বিজেপি সরকার উচ্চবর্ণের সংরক্ষণের আওতায় আসার সর্বোচ্চ আর্থিক সীমা ধরেছে ৮ লক্ষ টাকা বার্ষিক পারিবারিক আয়কে। কীসের ভিত্তিতে এই মাপকাঠি ধরলেন বিজেপি নেতারা? বছরে আড়াই লক্ষ টাকার বেশি রোজগার হলে এই সরকারই তো আয়কর ধার্য করে। অর্থাৎ তাদের আর দরিদ্র বলে ধরে না। তা হলে এখন বার্ষিক আট লক্ষ টাকা পর্যন্ত আয়ের মানুষ, যাঁদের মাসিক আয় প্রায় ৬৬ হাজার টাকা পর্যন্ত, তারা সবাই পিছিয়ে পড়া তথা দরিদ্র হয়ে গেলেন কী করে? অর্থাৎ যাঁদের ৫-১০-১৫ হাজার টাকা আয় আর যাঁদের ৫০-৬০-৬৬ হাজার টাকা আয়, তাঁরা সকলেই একই সংরক্ষণের আওতায় এসে গেলেন। সেই তো পিছিয়ে পড়া অংশের মানুষদের সুবিধাভোগী অংশের মানুষদের সাথেই প্রতিযোগিতায় নামতে হচ্ছে। তা হলে এই সংরক্ষণের দ্বারা সত্যিকারের পিছিয়ে পড়াদের নতুন কী সুবিধা হল?

আরও একটি প্রশ্ন। অতি সম্প্রতি দেশব্যাপী দু'দিনের যে সাধারণ ধর্মঘট হয়ে গেল তার দাবিগুলির অন্যতম ছিল শ্রমিকদের ন্যূনতম বেতন মাসে ১৮ হাজার টাকা করতে হবে। এটি শ্রমিকদের দীর্ঘদিনের দাবি যা কোনও সরকারই মানেনি। অর্থাৎ সংরক্ষণের প্রশ্নে সরকার নিজেই যে দারিদ্রসীমা নির্ধারণ করে দিল সেই সীমার এক-তৃতীয়াংশ বেতনটুকুও কিন্তু সে দেশের শ্রমিকদের দিতে রাজি নয়। যে সরকার দরিদ্র শ্রমিকদের এটুকু দিতে রাজি নয়, সেই সরকারই তাদের সন্তানদের শিক্ষা এবং চাকরির জন্য খুবই চিন্তিত হয়ে পড়েছে, এ কথা ভাবার কোনও কারণ থাকতে পারে কি? এটা একটা ডাহা মিথ্যাচার ছাড়া আর কিছু নয়।

ক'দিন আগেই পাঁচটি রাজ্যের নির্বাচনে বিজেপি গোহারা হেরেছে। তার মধ্যে তিনটি গুরুত্বপূর্ণ রাজ্যেই ছিল বিজেপি শাসন। এই ফল বিজেপি নেতাদের শিরদাঁড়া দিয়ে হিমস্রোত বইয়ে দিয়েছে। গত সাড়ে চার বছরে বিজেপি সরকারের প্রতিটি পদক্ষেপ দেশের সাধারণ মানুষের সাথে প্রতারণা বলে প্রমাণ হয়েছে। কালো টাকা উদ্ধার, মূল্যবৃদ্ধি রোধ, কর্মসংস্থান, সব কা বিকাশ, আচ্ছে দিন, মেক ইন ইন্ডিয়া, নোট বাতিল, জিএসটি— প্রত্যেকটি! এর মধ্যে কালো টাকা উদ্ধারের প্রতিশ্রুতিকে বিজেপি সভাপতি নিজেই জুমলা অর্থাৎ জনগণকে দেওয়া মিথ্যা প্রতিশ্রুতি বলে স্বীকার করেছেন। অন্যগুলি বিজেপি নেতারা নিজেরা স্বীকার না করলেও দেশের মানুষের আজ আর বুঝতে অসুবিধা নেই যে সেগুলিও সবই এক একটি জুমলা, তাঁদের সাথে প্রতারণা। সদ্য হয়ে যাওয়া বিধানসভাগুলির নির্বাচনে বিজেপি নেতারা রামমন্দির নির্মাণের সাম্প্রদায়িক তাসটি খেলেছিলেন। কিন্তু জীবনের অজস্র সমস্যায় জর্জরিত সাধারণ মানুষ সেই ফাঁদে পা দেয়নি। বাস্তবে বিজেপি নেতাদের একের পর এক চালাকি আর প্রতারণার রাজনীতির কোনওটিই কাজে আসেনি। বিজেপি নেতারা বুঝেছেন, এগুলির দ্বারা দেশের মানুষকে ভোলানো যাচ্ছে না। অথচ সামনেই নির্বাচন। মানুষকে ভোলাতে নতুন একটা কিছু চাই। তাই মরিয়া হয়ে এবার উচ্চবর্ণের তাস খেলেছেন— যদি কাজ দেয়!

সত্যিই যদি পিছিয়ে পড়া মানুষদের শিক্ষা এবং কাজ দেওয়া বিজেপি সরকারের উদ্দেশ্য হত, তবে বিজেপি কেন্দ্রে ক্ষমতায় বসার আগে বছরে দু'কোটি বেকারের চাকরি দেওয়ার যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল, তা পালন করার চেষ্টা করত। বাস্তবে বছরে দু'লক্ষ চাকরিও সৃষ্টি করতে পারেনি। উপরন্তু রেল, রাষ্ট্রায়ত্ত ক্ষেত্র সহ সরকারি সমস্ত ক্ষেত্রে নিয়োগ বন্ধ। লক্ষ লক্ষ সরকারি পদ খালি। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে যথেষ্ট শিক্ষক নেই, হাসপাতালগুলিতে পর্যাপ্ত চিকিৎসক, নার্স, কর্মী নেই। অফিসগুলিতে কর্মচারীর সংখ্যা কম। যতটুকু নিয়োগ হচ্ছে তার সবই ঠিকা প্রথায়, চুক্তির ভিত্তিতে। এর উপর বিজেপি সরকারের নোট বাতিলের সিদ্ধান্তে লক্ষ লক্ষ মানুষ, কাজ হারিয়েছেন, উদারিকরণ নীতির ফলে ক্রমাগত কর্মসংকোচন হয়ে চলেছে। এই অবস্থায় চাকরির জন্য নতুন করে সংরক্ষণ— বেকার সমস্যায় জর্জরিত যুবসমাজের সঙ্গে এক নির্মম রসিকতা ছাড়া আর কিছুই নয়। যখন মণ্ডল কমিশনের মধ্য দিয়ে অন্য পিছিয়ে পড়া অংশের জন্য সংরক্ষণ নিয়ে আসা হয়েছিল, সেদিনও আমরা বলেছিলাম, এর দ্বারা মানুষের আর্থিক দুরবস্থার কোনও পরিবর্তন ঘটবে না। এ শুধু ভোটের লক্ষ্যে মানুষকে প্রতারণা। জাতপাতের ভিত্তিতে মানুষকে বিভক্ত করে দেওয়া। ইতিমধ্যেই জাঠ, প্যাটেল, মারাঠা প্রভৃতি নেতারা তাঁদের গোষ্ঠীর জন্য আলাদা করে সংরক্ষণের দাবি তুলতে শুরু করেছেন। এ জিনিস যে ঘটবে, তা বিজেপি নেতা-মন্ত্রীদের অজানা নয়। বাস্তবে শোষিত-বঞ্চিত জনগণের বিভিন্ন গোষ্ঠীকে তাদের দুরবস্থার জন্য পরস্পরকে দায়ী করে ভ্রাতৃঘাতী সংঘর্ষে লিপ্ত করিয়ে দেওয়া এবং তার থেকে নির্বাচনে ফয়দা তোলার লক্ষ্যেই নতুন সংরক্ষণের ধুয়া তুলছে বিজেপি।

ক্ষমতায় ফেরার উদগ্র বাসনায় বিজেপি নেতারা সংবিধানকেও তুড়ি মেরে উড়িয়ে দিতে চেয়েছেন। সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ রয়েছে— সংরক্ষণ কোনও ভাবেই ৫০ শতাংশ ছাড়ানো যাবে না। এসসি, এসটি, ওবিসি সব মিলিয়ে তা এতদিন ছিল ৪৯.৫ শতাংশ। এবার ১০ শতাংশ বেড়ে তা হয়ে গেল ৫৯.৫ শতাংশ। ফলে শেষ পর্যন্ত সাংবিধানিক বিচারেও এই আইন দাঁড়াবে কি না, তা দেখার।

এই আইনটিকে আনতে গিয়ে বিজেপি নেতারা সমস্ত সংসদীয় রীতিনীতিকেও দু'পায়ে মাড়িয়েছেন। যে কোনও আইন পাশ করানোর আগে তা নিয়ে যে দীর্ঘ আলাপ-আলোচনার দরকার হয়, পরিকল্পিত ভাবেই তা করতে দিলেন না বিজেপি নেতারা। বিলের কপিও সাংসদদের আগে থেকে দেওয়া হয়নি। এ নিয়ে দেশের মানুষের মতামতও নিলেন না তাঁরা। গণতন্ত্র সম্পর্কে বিজেপির সত্যিকারের মনোভাবটা কী তা এই ঘটনা থেকেই স্পষ্ট। প্রধানমন্ত্রীর প্রথম দিন সংসদে ঢোকার সময়ে সিঁড়িতে সাষ্টাঙ্গে প্রণামের দৃশ্য সবার মনে আছে। পার্লামেন্টকে সেদিন গণতন্ত্রের মন্দির বলেছিলেন তিনি। এই কি তার পরিচয়! দেশের মানুষের সাথে প্রতারণার উদ্দেশ্যেই সেদিন এই নাটক করেছিলেন তিনি। বাস্তবে আজ দেশে দেশে সমস্ত পুঁজিবাদী দলগুলির চেহারাই এই। পার্লামেন্টারি গণতন্ত্রের খোলসটুকুই টিকে আছে মাত্র। ইরাকে সাদ্দাম হোসেন সরকারের বিরুদ্ধে মার্কিন দোসর হিসাবে সেনা পাঠানোর জন্য পার্লামেন্টকে মিথ্যা তথ্য দিয়ে কীভাবে প্রতারিত করেছিলেন ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী টনি ব্লেয়ার, তা আজ সবার জানা। সাম্রাজ্যবাদী আমেরিকার পার্লামেন্টের চরিত্রও ধারাবাহিকভাবে দেশের এবং সারা বিশ্বের জনগণের সাথে প্রতারণারই ইতিহাস। ইরাক, আফগানিস্তান, লিবিয়া, সিরিয়া সহ বিশ্বের বহু দেশই তার সাক্ষী।

যে সরকারগুলি সংরক্ষণের টোপ ঝুলিয়ে নির্বাচনে মানুষের সমর্থন জোগাড়ে এত তৎপর, কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে তাদের কোনও তৎপরতা নেই। তা ছাড়া, তাঁরা এ প্রশ্নের উত্তর দেন না যে, দেশের খনিজ, বনজ, জলজ এত সম্পদ, এত উর্বর জমি, কর্মক্ষম এত মানুষ, মানুষের এত প্রয়োজন থাকা সত্ত্বেও কেন সেই প্রয়োজন মেটানোর জন্য পর্যাপ্ত উৎপাদন হয় না, কেন সেই উৎপাদনের জন্য অজস্র কলকারখানা স্থাপন করে বেকারদের কাজের ব্যবস্থা করা হয় না? শোষক এবং শোষিতে বিভক্ত এই সমাজে এই সব দলগুলিই যেহেতু পুঁজিপতি শ্রেণির পলিটিক্যাল ম্যানেজার হিসাবে তাদের স্বার্থই রক্ষা করছে, তাই এই প্রশ্নের উত্তর এরা দেবে না। উত্তর দিলে এ সত্য উদঘাটিত হয়ে যাবে যে, শোষণমূলক এই পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ সাধারণ মানুষের প্রয়োজন মেটানোর জন্য উৎপাদন হয় না, উৎপাদন হয় পুঁজিপতি শ্রেণির মুনাফার দিকে লক্ষ রেখে। দেশের যুব সমাজ কাজ পেল কি না, সাধারণ মানুষ খেতে-পরতে পেল কি না, তাতে তাদের কিছু যায় আসে না। বিজেপির আনা এই সংরক্ষণের উদ্দেশ্যও তাই। তাদের একমাত্র উদ্দেশ্য বেকার যুব সমাজের সামনে চাকরির এই টোপ ঝুলিয়ে নির্বাচনে তাদের সমর্থন আদায় করা। কিন্তু দেশের মানুষ আগের প্রতারণাগুলির মতো এই প্রতারণাও ঠিক ধরে ফেলবে। তারপর হয়ত আবার নতুন কোনও প্রতারণার ফাঁদ পাতবেন বিজেপি নেতারা!

অবিজ্ঞানের ফেরিওয়ালা বিজেপি বিজ্ঞানবধে নেমেছে

ভারতে বিজ্ঞানের সবচেয়ে বড় মঞ্চ'ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেস' কি প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির রাজত্বে ক্রমেই বিজ্ঞানবিরোধী চিন্তা প্রচারের মঞ্চে পরিণত হচ্ছে? বিগত কয়েক বছর ধরে ঘটনাক্রম এবং ধারাবাহিক বিজ্ঞান কংগ্রেসগুলির কার্যক্রম এই আশঙ্কাকেই প্রবল করে তুলেছে। আশঙ্কিত দেশের বিজ্ঞানী মহল, বিজ্ঞান সংগঠন এবং বিজ্ঞানপ্রিয় জনগণ প্রতিবাদে সামিল হচ্ছেন, রাস্তায় নামছেন। কিছুদিন আগে অংশগ্রহণও করেছেন 'বিজ্ঞানের জন্য পদযাত্রায়'।

শুরুটা হয়েছিল প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির হাত ধরেই। তাঁর পদাঙ্ক অনুসরণ করে পারিষদরা বলছেন শতগুণ। এই ধারায় সর্বশেষ সংযোজন পাঞ্জাবের জলন্ধরে ৩-৭ জানুয়ারি অনুষ্ঠিত ১০৬তম বিজ্ঞান কংগ্রেসে অন্ধ্র বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য নাগেশ্বর রাওয়ের ভাষণ, যেখানে তিনি বলছেন, ডারউইনের বিবর্তনবাদের বহু আগে গীতায় উল্লিখিত দশাবতার তত্ত্বও প্রাণীজগতের বিবর্তনকে ব্যাখ্যা করেছিল এবং তা ডারউইনের তত্ত্বের চেয়ে অনেক বেশি উন্নত। একই সঙ্গে তিনি দাবি করেছেন — কৌরবদের জন্ম স্টেম সেল থেকে, টেস্ট টিউব প্রযুক্তির মাধ্যমে। বিষ্ণুর হাতের সুদর্শন চক্র আসলে ক্ষেপণাস্ত্র, যা লক্ষ্যবস্তুকে আঘাত করে আবার তার হাতে ফিরে আসত। শুধু পুষ্পক রথ নয়, রাবণের অন্তত ২৪ ধরনের বিভিন্ন মাপের, বিভিন্ন ক্ষমতাসম্পন্ন বিমান ছিল। আর এক বক্তা কান্নন জগথালা কৃষ্ণনের দাবি, আইনস্টাইন-নিউটনের হাত ধরে তৈরি হওয়া আধুনিক পদার্থবিদ্যা আদ্যন্ত ভুল। তাঁর আবদার, মহাকর্ষীয় তরঙ্গের নাম দিতে হবে 'মোদি তরঙ্গ', আর মহাকর্ষের প্রভাবে আলোর বেঁকে যাওয়াকে বলা হবে 'হর্ষবর্ধন ঘটনা'।

এমন দাবি বিগত কয়েক বছর ধরে প্রধানমন্ত্রী সহ বিজেপির নানা নেতা-মন্ত্রীর মুখে বারবার উচ্চারিত হয়েছে। ২০১৪ সালে মুম্বইতে এক হাসপাতালের উদ্বোধন করতে গিয়ে প্রধানমন্ত্রী দাবি করেছিলেন, প্রাচীন ভারতে যে প্লাস্টিক সার্জারি ছিল, গণেশের হাতির মাথাই নাকি তার অকাট্য প্রমাণ। তারই মন্ত্রীসভার এক গুরুত্বপূর্ণ সদস্য, মানবসম্পদ উন্নয়ন মন্ত্রকের প্রতিমন্ত্রী সত্যপাল সিং বলেছিলেন, ডারউইনের তত্ত্বও বৈজ্ঞানিক দিক থেকে ভ্রান্ত, কেন না কোনও বাঁদরকে মানুষ হয়ে যেতে কেউ দেখেনি। তাই তা স্কুল-কলেজের সিলেবাস থেকে বাদ দেওয়া উচিত। রাজস্থানের শিক্ষামন্ত্রী বাসুদেব দেবনানি দাবি করেছিলেন, গরু নাকি শ্বাস-প্রশ্বাসে অক্সিজেন ছাড়ে। ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব দেব আরও এক কাঠি এগিয়ে দাবি করেন, মহাভারতের যুগে নাকি ইন্টারনেট ছিল, না হলে যুদ্ধের খবর ধৃতরাষ্ট্রের কাছে পৌঁছত কীভাবে? ২০১৫ সালের বিজ্ঞান কংগ্রেসে ক্যাপ্টেন বোদাস নামে এক ব্যক্তি দাবি করেছিলেন, বৈদিক যুগে নাকি এরোপ্লেন ছিল। আর তা নাকি শুধু এক দেশ থেকে অন্য দেশেই নয়, এক গ্রহ থেকে অন্য গ্রহেও যেতে পারত। কেন্দ্রীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রী হর্ষবর্ধন ২০১৮ সালে মণিপুরে বিজ্ঞান কংগ্রেসে সদ্যপ্রয়াত বিজ্ঞানী স্টিফেন হকিং-এর নাম উল্লেখ করে দাবি করেছিলেন, তাঁর মতে, বেদের সূত্রগুলি সম্ভবত আইনস্টাইনের বিখ্যাত $E=mc^2$ সূত্রের চেয়েও উন্নত। অবশ্য এই দাবির সপক্ষে কোনও তথ্য মাননীয় মন্ত্রী উপস্থিত করতে পারেননি।

সবকটি দাবিই এক সূত্রে গাঁথা। যুক্তিহীন অন্ধবিশ্বাস আর ধর্মীয় গোঁড়ামির ভিত্তিতে প্রাচীন ভারতের বিজ্ঞান-প্রযুক্তির কাল্পনিক মহিমাকীর্তন। কোনও দাবির সপক্ষে কোনও প্রমাণ দাখিলের ব্যাপারই নেই। ব্যক্তিগত বিশ্বাসের ওপর ভিত্তি করে রামায়ণ-মহাভারতের কাহিনিগুলোকেই ঐতিহাসিক সত্য বলে চালানো। বৈদিক যুগের শ্রেষ্ঠত্বের জয়গান গেয়ে হিন্দুত্ব-অ্যাজেন্ডার প্রতিষ্ঠা।

বিশ্বাসের সঙ্গে বিজ্ঞানের বিরোধ সর্বযুগে সর্বকালে। কোপার্নিকাস, গ্যালিলিওরা যখন বহু বছরের পর্যবেক্ষণ ও তত্ত্বনির্মাণের ভিত্তিতে এ সত্যে পৌঁছেছিলেন যে পৃথিবী স্থির নয়, তা গতিশীল, সূর্যকে তা নিরন্তর প্রদক্ষিণ করছে, তখন সে যুগের মানুষ তা বিশ্বাস করেনি। কারণ, বাইবেল তাদের শিখিয়েছে পৃথিবী স্থির। সূর্যই পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করছে। ডারউইন যথার্থ বিজ্ঞানমনস্কতা নিয়ে বিবর্তনের রহস্য উদঘাটনে ব্রতী হয়েছিলেন, সত্যানুসন্ধানের প্রয়োজনে দীর্ঘ পাঁচ বছর জলপথে দুই আমেরিকার অজস্র পাহাড়-জঙ্গল চষে বেড়িয়েছেন, সেখানকার নানা প্রজাতি ও প্রাণী বৈচিত্র্যকে খুঁটিয়ে লক্ষ করেছেন, অজস্র জীবাশ্ম সংগ্রহ করেছেন এবং দেশে ফিরে সুদীর্ঘ বারো বছর সংগৃহীত তথ্যগুলিকে বারবার নানাভাবে পরীক্ষা করে তবেই প্রাকৃতিক নির্বাচন তত্ত্ব দাঁড় করিয়েছেন। তাঁর সময়েও বহু মানুষ সহজে তা মেনে নেয়নি। পুরনো বিশ্বাসের বশবর্তী হয়ে তারাও সেদিন নানা যুক্তিতে তাকে অস্বীকার করতে চেয়েছে। বিজ্ঞানকে চলার পথ তৈরি করতে হয়েছে অবিজ্ঞানের সঙ্গে লড়াই করেই।

বিজ্ঞান-কংগ্রেসে অবিজ্ঞানের প্রচার ও তার বিরুদ্ধে বিজ্ঞানীদের সংঘবদ্ধ প্রতিবাদ দেখিয়ে দিল এই লড়াই এখনও চলছে। বিজ্ঞান-কংগ্রেসে অবিজ্ঞান প্রচারের খবর প্রকাশ হতেই কর্ণাটকের বেঙ্গালুরু, কেরালার কোচিন ও কোট্টায়াম, অন্ধ্রপ্রদেশের অনন্তপুর, ত্রিপুরার আগরতলা, মধ্যপ্রদেশের গুনা ও ইন্দোর, ঝাড়খণ্ডের জামশেদপুর, দিল্লি ইত্যাদি শহরে বিক্ষোভ প্রদর্শন হয়। পশ্চিমবঙ্গেও রাজাবাজার সায়েন্স কলেজ, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়, প্রেসিডেন্সি বিশ্ববিদ্যালয়, মেদিনীপুর কলেজ, পাঁশকুড়া কলেজ ও বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রছাত্রী ও অধ্যাপকরা বিক্ষোভ দেখান। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিক্ষোভে অংশগ্রহণ করে খ্যাতনামা বিজ্ঞানী অধ্যাপক অমিতাভ দত্ত সাংবাদিকদের বলেন, 'প্রাচীন ভারতে বিজ্ঞানের অগ্রগতি কতটা হয়েছিল তা বোঝাতে রাম-রাবণ-গান্ধারীর কি খুব প্রয়োজন? চরক, শুশ্রুত, কণাদ, আর্যভট্ট, বরাহমিহির, ব্রহ্ম গুপ্ত, ভাস্করাচার্য ইত্যাদিদের গৌরবময় জ্যোতির্বিজ্ঞান, বীজগণিত, ত্রিকোণমিতি, চিকিৎসাশাস্ত্র ইত্যাদি চর্চার কথা বলা যায় না?' হায়দরাবাদে প্রেস কনফারেন্স করে সেন্টার ফর সেল অ্যান্ড মলিকিউলার বায়োলজির প্রাক্তন অধিকর্তা অধ্যাপক মোহন রাও এই অবিজ্ঞানের প্রচারের প্রতিবাদ জানান। বিখ্যাত জ্যোতির্পদার্থবিদ অধ্যাপক জয়ন্ত বিষ্ণু নারলিকার সহ ৩৭ জন বিজ্ঞানী যৌথভাবে ইন্ডিয়ান সায়েন্স কংগ্রেস অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতিকে চিঠি লিখে আগামীদিনে এরকম ঘটনার পুনরাবৃত্তি যাতে না হয় তা নিশ্চিত করতে উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি

এ দেশের শিক্ষাব্যবস্থাটা বিজ্ঞানসম্মত না হওয়ায় শিক্ষার আলো যারা পায় তাদের মধ্যেও বিজ্ঞানমনস্কতা গড়ে ওঠে না। বিজ্ঞান পড়লেও বিজ্ঞান কীভাবে চিন্তা করতে শেখায় তা ছাত্ররা শেখে না। অতীতে কী ঘটেছিল তা হয়তো ছাত্ররা পড়ে, কিন্তু তা কীভাবে জানা গেল তা তাদের জানানো হয় না। ইতিহাস যে প্রমাণ দাবি করে, তা তাদের শেখানো হয় না। তাদের মন বিশ্বাস করতেই শেখে, প্রশ্ন করতে যাচাই করতে শেখে না। আর অবিজ্ঞানের কারবারিরা এই ফাঁকটাকেই ব্যবহার করে।

জানান। সংবাদে প্রকাশ, অন্যান্য বছরের মতো বিজ্ঞানীসমাজের এই সম্মিলিত প্রতিবাদকে অস্বীকার না করতে পেরে ইন্ডিয়ান সায়েন্স কংগ্রেস অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি ঘটনার জন্য দুঃখপ্রকাশ করেছেন এবং কিছু ব্যবস্থা গ্রহণের অঙ্গীকারও করেছেন।

কিন্তু এর ফলে অবিজ্ঞানের ফেরিওয়ালারা নিরস্ত হবেন কি?

আসলে, এ দেশের শিক্ষাব্যবস্থাটা বিজ্ঞানসম্মত না হওয়ায় শিক্ষার আলো যারা পায় তাদের মধ্যেও বিজ্ঞানমনস্কতা গড়ে ওঠে না। বিজ্ঞান পড়লেও বিজ্ঞান কীভাবে চিন্তা করতে শেখায় তা ছাত্ররা শেখে না। অতীতে কী ঘটেছিল তা হয়তো ছাত্ররা পড়ে, কিন্তু তা কীভাবে জানা গেল তা তাদের জানানো হয় না। ইতিহাস যে প্রমাণ দাবি করে, তা তাদের শেখানো হয় না। তাদের মন বিশ্বাস করতেই শেখে, প্রশ্ন করতে যাচাই করতে শেখে না। আর অবিজ্ঞানের কারবারিরা এই ফাঁকটাকেই ব্যবহার করে।

তারা বোঝায়, রামায়ণ-মহাভারত-পুরাণ-উপনিষদের গল্পগাথায় যা যা আছে, সবই এককালে ঘটেছিল। এসবই ইতিহাস। আসলে রামায়ণ-মহাভারত খুবই উন্নতমানের সাহিত্য। সমস্ত সাহিত্যের মতোই তার চরিত্র ও ঘটনাবলি কাল্পনিক। কবির কল্পনায় যা ধরা দিয়েছে তা সাজিয়েই তার কাহিনীচিত্রণ। একজন কবি নয়— আজ প্রমাণ পাওয়া গেছে রামায়ণ ও মহাভারত লেখা হয়েছে সাত-আটশো বছর ধরে। অর্থাৎ বহু মানুষের কল্পনা সংযোজিত হয়ে ধীরে ধীরে সমৃদ্ধহয়ে কাহিনিগুলি আজকের রূপ নিয়েছে। তাই তার মধ্যে বিশেষ কালের ইতিহাস খুঁজতে যাওয়া বৃথা।

এঁরা খোঁজেন শুধু ইতিহাসই নয়, বিজ্ঞান-প্রযুক্তিও। আছে পুষ্পক রথের কথা, অতএব এরোপ্লেন ছিল। আছে ব্রহ্মাস্ত্রের কথা, অতএব অ্যাটম বোমা ছিল। গান্ধারীর শতপুত্র কীভাবে জন্মাতে পারে? অতএব স্টেম সেল থেকেই কৌরবদের জন্ম। আছে ঘটোৎকচের মতো দৈত্যের কথা, অতএব নিশ্চয়ই সে জন্মেছিল জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং-এর সাহায্যে।

লক্ষ করার বিষয়, এরোপ্লেন আবিষ্কার হওয়ার আগে কিন্তু কেউ বলেননি মহাভারতের যুগে এরোপ্লেন ছিল। অ্যাটম বোমা আবিষ্কার হবার আগে কিন্তু কেউ বলেননি পাশুপত অস্ত্র বা ব্রহ্মাস্ত্র আসলে অ্যাটম বোমা। বিজ্ঞান স্টেম সেলের চরিত্র আবিষ্কার করার আগে কিন্তু মহাভারত পড়ে গান্ধারীর শতপুত্রের বিষয়টা কারও মাথায় আসেনি। ১৯৮০-র দশকে ইন্টারনেট প্রযুক্তি প্রবর্তনের আগে কেউ ত্রেতাযুগে ইন্টারনেটের প্রচলনের কথা বলেননি। যদি সত্যিই বেদ-উপনিষদে আধুনিক বিজ্ঞান থাকত, তাহলে সেসব শ্লোক পড়ে কেউ তো কখনও কোনও একটা আবিষ্কার করে ফেলতে পারতেন। কেউ পারেননি।

কোনও প্রযুক্তিই হঠাৎ গজিয়ে ওঠে না। উড়োজাহাজ তৈরি করার আগে মানুষকে থার্মোডায়নামিক্স আর এয়ারোডায়নামিক্সের নিয়মকানুন আবিষ্কার করতে হয়েছে। অ্যাটম বোমা তৈরি করতে আগে পরমাণুর অন্দরমহলের নিয়মকানুন অর্থাৎ কোয়ান্টাম মেকানিক্স আবিষ্কার করতে হয়েছে। জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং-এর কথা ভাবার আগে বংশগতির নিয়ম আবিষ্কার করতে হয়েছে, ডিএনএ অণুর চরিত্র বুঝতে হয়েছে। তত্ত্ব বোঝার আগে প্রযুক্তির উদ্ভাবন সম্ভব নয়। তাই এসব তত্ত্ব বৈদিক যুগের মানুষের জ্ঞানজগতে থাকার কোনও চিহ্নই নেই, থাকা সম্ভবও ছিল না।

বিজ্ঞানে কোনও তত্ত্ব প্রতিষ্ঠা করতে হলে পরীক্ষা-পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে প্রমাণ দিতে হয়। সেরকম, ইতিহাসে কোনও কথা প্রতিষ্ঠা করতে হলে প্রত্নতাত্ত্বিক প্রমাণ দিতে হয়। সেযুগে এরোপ্লেন থাকলে দু-একটা ভাঙা টুকরো মাটি খুঁড়লে অবশ্যই পাওয়া যাবে। মানুষের ধড়ে হাতির মাথা বসানোর প্রযুক্তি আবিষ্কার হয়ে থাকলে সেরকম দু-একটা ফসিল অবশ্যই পাওয়া যাবে। কুরুক্ষেত্রের মাটি খুঁড়লে পাওয়া যাবে দু-একটা গদা। কিংবা যুদ্ধের ধারাবিবরণী দেওয়ার জন্য ব্যবহৃত ক্লোজসার্কিট টিভির টুকরো। অবিজ্ঞানের কারবারিরা কিন্তু এসব প্রমাণের ধারে কাছে ঘেঁষেন না।

এই কূপমণ্ডুক ধর্মান্ধমানসিকতাকে তীব্র কষাঘাত করে আজ থেকে প্রায় পৌনে দু'শো বছর আগে বিদ্যাসাগর বলেছিলেন, এরা সামনের দিকে তাকাতে ভুলে গেছে। পাশ্চাত্য দেশে বিজ্ঞানের কোনও নতুন আবিষ্কার হলে তারা সহজে তা মেনে নিতে চায় না। আবার বেদের যুগের কোনও কিছুর সঙ্গে এর সামান্যতম মিল পেলে তাদের আত্মশ্লাঘা স্ফীত হয়ে ওঠে। যুক্তি তোলে, বেদেই যখন সব আছে তখন পাশ্চাত্যের জ্ঞান-বিজ্ঞান জানার প্রয়োজন কী? এই অচল অনড় মনোভাবকে ব্যঙ্গ করে প্রখ্যাত বিজ্ঞানী ডঃ মেঘনাদ সাহা লিখেছিলেন, 'সব ব্যাদে আছে'। বিদ্যাসাগর, মেঘনাদ সাহাদের এই লড়াই আজ আবার এক নতুন রূপে ফিরে এসেছে।

কেন্দ্রে ক্ষমতাসীন এইসব বিজ্ঞানবিরোধীরা চায় মানুষের যুক্তিবাদী মন ও বিজ্ঞানমনস্কতাকে মেরে দিয়ে তার জায়গায় অন্ধতা, গোঁড়ামি আর কুসংস্কার গেঁথে দিতে। আধুনিক জীবনে বিজ্ঞানকে সম্পূর্ণ অস্বীকার করার ক্ষমতা এদের নেই। ফলে এরা ধ্বংস করছে বিজ্ঞানমনস্কতাকে, সত্যানুসন্ধানী মনকে। নিচ্ছে বিজ্ঞানের শুধু কারিগরি দিক। এটাই তো ফ্যাসিবাদের হাতিয়ার। বহুদিন আগে এ যুগের অন্যতম মহান মার্কসবাদী চিন্তানায়ক কমরেড শিবদাস ঘোষ ফ্যাসিবাদের এই চরিত্র উদঘাটিত করে বলেছিলেন, বিজ্ঞান ও অধ্যাত্মবাদের এক অদ্ভুত সংমিশ্রণের মধ্য দিয়ে ফ্যাসিবাদের আদর্শগত ও সংস্কৃতিগত ভিত রচিত হয়। এদেশের একচেটিয়া পুঁজির সমর্থনে বিজেপি-আরএসএস বাহিনী ঠিক সেই কাজটিই করে চলেছে। তারা জানে, মানুষকে অজ্ঞ, অন্ধ রাখতে পারলেই তাদের শোষণ, শাসন চালাবার সুবিধা। সময় থাকতে এই বিপদ সম্পর্কে সজাগ না হলে আগামী দিনে এর জন্য অনেক বড় মূল্য আমাদের দিতে হবে।

কাকোরী শহিদ স্মরণ

ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের আপসহীন বিপ্লবী ধারার অত্যন্ত উজ্জ্বল অধ্যায় কাকোরী ষড়যন্ত্র মামলায় শহিদ রামপ্রসাদ বিসমিল, আসফাকউল্লা খান, রাজেন্দ্রনাথ লাহিড়ি, ঠাকুর রোশন সিং-এর ফাঁসির মঞ্চে আত্মাহুতির ঘটনা। কাকোরী ঘটনার ৯১তম বার্ষিকীতে ১৯ ডিসেম্বর বিহারের পাটনায় এবং মজফফরপুর জেলার কাঁটিতে এ আই ডি এস ও এবং এ আই ডি ওয়াই ও শহিদ স্মরণ অনুষ্ঠানের আয়োজন করে।

শহিদদের স্মৃতিতে আলোচনা, সঙ্গীত ইত্যাদিতে ছাত্র-যুবকরা অংশ নেন। পাটনার সভায় বহু বিশিষ্ট মানুষ অংশগ্রহণ করেন।

পথবাসীদের কম্বল বিতরণ

'অন্তত কিছুটা বরুণের মতো হও'— উপস্থিত ছাত্র-যুবকদের আহ্বান জানালেন বিশিষ্ট গণসঙ্গীত শিল্পী প্রতুল মুখোপাধ্যায়। ঘাতকবাহিনীর হাতে নিহত সুঁটিয়ার প্রতিবাদী শিক্ষক বরুণ বিশ্বাস স্মরণে ৬ জানুয়ারি মধ্য কলকাতার গরিব-ফুটপাথবাসী শতাধিক মানুষের মধ্যে কম্বল বিতরণের অনুষ্ঠানে।

বরুণ বিশ্বাস স্মৃতি রক্ষা কমিটির পক্ষ থেকে আয়োজিত রাজাবাজার সায়েন্স কলেজের কাছে এথেনিয়াম ইনস্টিটিউশনে এক সভায় এ ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন সঙ্গীত শিল্পী কল্যাণ সেন বরাট, পাবলিক রিলিফ সোসাইটির সভাপতি অজয় চ্যাটার্জী ও স্মৃতি রক্ষা কমিটির সম্পাদক বিশ্বজিৎ মিত্র প্রমুখ।

সাংসদদের ৫০ হাজার

একের পাতার পর

কথা। অথচ তা সেই অনুপাতে বাড়ানো হয় না। খেতমজুরদের ন্যূনতম মজুরি মেলে না। সুপ্রিম কোর্ট সহ নানা আদালত বারেবারে বলছে, ন্যূনতম মজুরির কম দিলে তা 'ফোর্সড লেবার' বা দাস-শ্রম। কিন্তু আইন-আদালতের ধার ধারে কে? ফলে ভয়াবহ অবস্থা খেতমজুরদের। সুখে-স্বচ্ছন্দে জীবন কাটানো দূর অস্ত, খাদ্য-বস্ত্র-ওষুধ-সন্তানের শিক্ষার ব্যয় বহন করা— এগুলির কোনওটাই এই মজুরিতে সম্ভব কি? কোনওরকমে বাঁচার চেষ্টা করে তারা। রাজ্য সরকারের কর্ণধাররাও চুপ। তারা কেন্দ্রের বিরুদ্ধে এত বিষোদগার করেন, অথচ এই অতি দরকারি বিষয়টি নিয়ে দরবার করতে পারেন না!

২০১৮-১৯ সালের এপ্রিল থেকে অক্টোবর পর্যন্ত ৭ মাসে রাজ্যে ১০০ দিনের কাজে গড়ে ৫২ দিন কাজ করেছে ৩৭ লক্ষ পরিবার— এই ঘোষণা করে 'উন্নয়নের' জয়গান গাইছেন তৃণমূল সরকারের পঞ্চায়েত মন্ত্রী। আবার পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন দপ্তরের রিপোর্টে জানা যাচ্ছে, মজুরি বকেয়া পড়ে রয়েছে ৪২১ কোটি টাকা। মানে যারা কাজ করেছে, তারাও সকলে বেতন পায়নি। অথচ অর্থবর্ষ শেষ হওয়ার তিন মাস আগেই এই প্রকল্পের বরাদ্দ সরকারি অর্থ নাকি প্রায় শেষ। এই হল ১০০ দিনের কর্মসংস্থান প্রকল্পের অবস্থা! মন্ত্রী একেই উন্নয়ন বলছেন!

সত্যিকারের উন্নয়ন হলে, সত্যিই মানুষের হাতে সারা বছর কাজ থাকলে সরকারকে বিপুল ব্যয়ে বারবার চোখ ঝলসানো উন্নয়নের বিজ্ঞাপন দিতে হত না। মানুষ তাদের সাদা চোখে এবং জীবনের অভিজ্ঞতাতেই উন্নয়নের সুফল টের পেতেন। ১০০ দিনের কাজ গ্রামীণ জনজীবনে অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। কিছুদিন আগে মুখ্যমন্ত্রী দাবি করেছেন রাজ্যে নাকি বেকারি কমেছে ৪০ শতাংশ এবং সেটা ১০০ দিনের প্রকল্পের জন্যই! এমনিতেই বহু মানুষ এই প্রকল্পের বাইরে রয়েছেন। কেন্দ্রীয় সরকারের রিপোর্ট অনুযায়ী, কাজের চাহিদা যত তার থেকে ৩২ শতাংশ কম কাজ পাচ্ছে মানুষ। তাতেও কীভাবে বেকারি কমে গেল তার ব্যাখ্যা পাওয়া গেল না। তার উপর যাঁরাও ১০০ দিনের কাজ প্রকল্পের অর্ন্তভুক্ত, তাঁরা বছরের বাকি ২৬৫ দিন কী কাজ করবেন, কীভাবে সংসার চালাবেন, তাই নিয়ে সরকারের কোনও মাথা ব্যথা নেই। খেতমজুরদের দাবি, বছরে অন্তত ২০০ দিনের কাজ চাই। চাই বাঁচার মতো মজুরি। কেন্দ্র-রাজ্য দুই সরকারের ভূমিকায় এই প্রকল্প ধুঁকছে। ক্ষোভ বাড়ছে খেটে-খাওয়া মানুষের। আগামী ৩০ জানুয়ারি এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট)-এর ডাকে হাজারে হাজারে তাঁরা আসবেন কলকাতায় মহামিছিলে।

উৎসাহ ও উদ্দীপনার সাথে উলগুলান বার্ষিকী পালিত

শহিদ বিরসা মুণ্ডার নেতৃত্বে সংগঠিত সামন্ততন্ত্র ও ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী আদিবাসী কৃষক বিদ্রোহ 'উলগুলানে'র ১১৯ তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী যথাযোগ্য মর্যাদা ও উৎসাহ-উদ্দীপনার সাথে পালিত হয় ৫ জানুয়ারি, কলকাতার ওয়াই চ্যানেলে। এই সংগ্রামের সৈনিকদের শৌর্য, বীর্য, তেজ, সাহসিকতা ও বীরত্ব বর্তমানে শোষণমুক্তির সংগ্রামের সৈনিকদের প্রেরণার উৎস।

কলকাতা মহানগরীর বুকে এই কর্মসূচি রূপায়িত করার মধ্য দিয়ে ফেডারেশন অফ আদিবাসী অর্গানাইজেশনস সর্বসমক্ষে এই শিক্ষাই তুলে ধরতে চেয়েছেন। সভাপতিত্ব করেন বিশিষ্ট সাঁওতালী সাহিত্যিক ও সমিতির সভাপতি সারদাপ্রসাদ কিস্কু। উপস্থিত ছিলেন ট্রাইবাল রিসার্চ ইনস্টিউট রাঁচী-র প্রাক্তন ডিরেক্টর সোমা সিং মুণ্ডা, অধ্যাপিকা মীরাতুন নাহার, সুলেমান মারান্ডি, গোটা ভারত সিদো-কানহু হুল বৈসী-র সাধারণ সম্পাদক বীরবল সিং, সম্পাদক, ওড়িশা মুণ্ডারী সাঁওয়ার জামদা ও অধ্যাপক সুভাষচন্দ্র মুণ্ডা, বুন্ডু কলেজ, রাঁচী, ঝাড়খণ্ড। স্বাগত ভাষণ দেন সমিতির সেক্রেটারি জেনারেল পরিমল হাঁসদা।

এই সভা থেকে সমিতির অন্যতম সহ-সভাপতি নেপাল সিং-এর নেতৃত্বে পাঁচ সদস্যের এক প্রতিনিধি দল রাজ্যপালের কাছে ৩৬ দফা দাবি সংবলিত স্মারকলিপি দেন। এই দাবিগুলির অন্যতম কয়েকটি হল— আদিবাসীদের জমির পড়চা সহ সকল প্রকার সরকারি নথিতে জাতি (সাব-কাস্ট) উল্লেখ করতে হবে এবং বেআইনি বিক্রি বন্ধ করতে হবে। হরিণঘাটা থানার মাহাত পদবিধারী বেদিয়া ও বৈগ্যাদের অবিলম্বে আদিবাসী জাতি প্রমাণপত্র প্রদান পুনরায় চালু করতে হবে, এস সি/এস টি আইডেন্টিফিকেশন আইন ১৯৯৪ প্রত্যাহার করতে হবে, সকল গরিব আদিবাসীদের জব কার্ড ও বি পি এল কার্ড দিতে হবে। ঝাড়গ্রাম ও শুশুনিয়া (পুরুলিয়া) একলব্য বিদ্যালয়ে ছাত্রীদের উপর যৌন নির্যাতনকারীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দিতে হবে, ঝাড়গ্রাম একলব্য বিদ্যালয়ের পরিচালনার দায়িত্ব পুনরায় সরকারকে নিতে হবে এবং আর কোনও একলব্য বিদ্যালয় পরিচালনার দায়িত্ব কোনও মিশন বা এন জি ও-র হাতে তুলে দেওয়া চলবে না, রাজ্যের সমস্ত সাঁওতালী মাধ্যম বিদ্যালয়গুলির পরিকাঠামো সরকারকেই গড়ে তুলতে হবে, সব বিষয়ে পর্যাপ্ত সংখ্যক সাঁওতালী জানা শিক্ষক নিয়োগ করতে হবে এবং নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের মূল্যবৃদ্ধি, শিক্ষায় ব্যয়বৃদ্ধি, স্বাস্থ্যের খরচবৃদ্ধি প্রভৃতি রোধ করতে হবে।

স্বরূপনগরে কে কে এম এস-এর ব্লক সম্মেলন

৭ জানুয়ারি উত্তর ২৪ পরগণা জেলায় স্বরূপনগর মাঝেরপাড়া প্রাইমারি স্কুলে এ আই কে কে এম এসের ষষ্ঠ ব্লক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলনে কৃষকদের ঋণ মকুব, ফসলের লাভজনক দাম, মিউটেশন চার্জ প্রত্যাহার ইত্যাদি দাবিতে তীব্র আন্দোলনের সিদ্ধান্ত হয়। সভাপতিত্ব করেন সুশান্ত ঘোষ। প্রধান বক্তা সংগঠনের রাজ্য সভাপতি কমরেড সেখ খোদাবক্স দেশের নানা রাজ্যের কৃষক আন্দোলনের দৃষ্টান্ত তুলে ধরে এ রাজ্যেও দুর্বার দীর্ঘস্থায়ী কৃষক আন্দোলন চালিয়ে যেতে গ্রাম সদস্য সংগ্রহ করে কৃষক কমিটি গড়ে তোলার আহ্বান জানান।

এ ছাড়াও বক্তব্য রাখেন জেলা সম্পাদক কমরেড দাউদ গাজী। যুগল সেনকে সভাপতি ও ছট্টু মির্জাকে সম্পাদক করে ২৩ জনের ব্লক কমিটি গঠিত হয়। সম্মেলন শেষে এক বিশাল মিছিল বিডিও অফিসে দাবিপত্র পেশ করে।

কলকাতা বইমেলায়
গণদাবী
স্টল নং ১৬৮

হাঙ্গেরিতে শ্রমিকবিরোধী আইনের বিরুদ্ধে প্রবল গণবিক্ষোভ

রাজধানী বুদাপেস্টে পার্লামেন্টের সামনে বিক্ষোভ

হাঙ্গেরিতে চরম শ্রমিকস্বার্থবিরোধী এক আইন এনেছেন সেখানকার দক্ষিণপন্থী প্রধানমন্ত্রী ভিক্টর ওরবান। এর বিরুদ্ধে দেশ জুড়ে বিক্ষোভের ঢেউ উঠেছে। নতুন আইনটিতে শ্রমিক-কর্মচারীদের কাজের নির্দিষ্ট সময়ের বাইরে বছরে ২৫০ থেকে ৪০০ ঘন্টা বেশি খাটিয়ে নেওয়ার অধিকার দেওয়া হয়েছে মালিকদের। বলা হয়েছে, বাড়তি পরিশ্রমের জন্য পাওনা বাড়তি টাকা সঙ্গে সঙ্গে মিটিয়ে দেওয়ারও দরকার নেই। তার জন্য মালিকরা তিন বছর পর্যন্ত সময় পাবেন। খুব স্বাভাবিক কারণেই এই কালা আইনের বিরুদ্ধে দেশের সাধারণ মানুষের ক্ষোভ তুঙ্গে উঠেছে। তারা আইনটির নাম দিয়েছে 'স্লেভ ল' অর্থাৎ 'দাসত্বের আইন'।

আইনটি পাশ হওয়ার আগে থেকেই এর বিরুদ্ধে পার্লামেন্টের সামনে বিক্ষোভ দেখাচ্ছিলেন শ্রমিকরা, চলতি মজুরির হার বৃদ্ধির দাবিও উঠেছিল সেখানে। বিক্ষোভের তীব্রতা ক্রমেই বাড়ছিল। ইতিমধ্যে এই আইন পাশ হয়ে যাওয়ায় ক্ষোভ চরমে ওঠে। গত ১৬ ডিসেম্বর রাজধানী বুদাপেস্টে ১৫ হাজারেরও বেশি শ্রমিক ও সাধারণ মানুষ প্রবল ঠাণ্ডা উপেক্ষা করে মিছিল করে টেলিভিশন সম্প্রচারের সদর দপ্তরের সামনে গিয়ে প্রবল বিক্ষোভ দেখান। দাবি তোলেন সরকারের বিরুদ্ধে তাঁদের বক্তব্য টেলিভিশনে প্রচার করতে হবে, জুলুমকারী সরকারের লেজুড় হয়ে না থেকে সম্প্রচার দপ্তরকে নিরপেক্ষ ভাবে কাজ করতে হবে। স্লোগান ওঠে 'ওরবান, গদি ছাড়ো'। বিক্ষোভকারীদের উপর পুলিশ নির্বিচারে কাঁদানে গ্যাস চালায়। বোঝাই যায় বিক্ষোভের তীব্রতায় ওরবান সরকার যথেষ্ট ভীত। বিশেষ করে ফ্রান্সের সাম্প্রতিক ইয়েলো ভেস্ট আন্দোলন শাসকদের হাড়ে কাঁপন ধরিয়ে দিয়েছে।

দেশের মানুষের এত বিরোধিতা সত্ত্বেও প্রধানমন্ত্রী ওরবান এই দাসত্ব আইনটি পাশ করাতে পারলেন কী করে? এটা সম্ভব হল শুধুমাত্র পার্লামেন্টে তাঁদের সংখ্যাগরিষ্ঠতার জোরে। হাঙ্গেরিতে বর্তমান দক্ষিণপন্থী শাসক দলগুলির জোট ২০০৬ সাল থেকে একসঙ্গে নির্বাচনে লড়ছে। ২০১০ সালে প্রথম তারা সংসদের দুই-তৃতীয়াংশ আসন দখল করে জয়লাভ করে। পরের নির্বাচনগুলিতে নানা কারচুপি করে এবং সুবিধামতো নিয়ম-কানুন পাল্টে জয় ধরে রাখে তারা। এখনও ওরবানের নেতৃত্বে এই দক্ষিণপন্থী জোটের হাতেই রয়েছে সংসদের দুই-তৃতীয়াংশ আসন।

ক্ষমতায় বসার পর থেকেই ওরবান তাঁর দক্ষিণপন্থী সহযোগীদের সঙ্গে নিয়ে দেশের ধনকুবের একচেটিয়া পুঁজিপতিদের মদতে তাদের স্বার্থে একের পর এক জনবিরোধী পদক্ষেপ নিয়ে চলেছেন। দেদার টাকা ঢেলে বিরোধী প্রচারমাধ্যমগুলিকে কিনে নিয়েছেন তাঁরা, নয়তো ভয় দেখিয়ে মুখ বন্ধ করে রাখা হয়েছে। নিয়ন্ত্রণ নিরঙ্কুশ করতে সমস্ত রাজনৈতিক ও বিচারবিভাগীয় উচ্চ পদগুলিতে বসানো হয়েছে ধনকুবেরদের অথবা সরকারের অনুগত লোকদের। ভূমিসংস্কার থেকে শুরু করে ব্যাঙ্কিং সংস্কারের নামে সমস্ত ক্ষেত্রেই নতুন নিয়মকানুন চালু করেছে সরকার। নিজেদের পছন্দের লোকজনকে নিয়ে ওরবান তৈরি করেছেন একটি কাউন্সিল যেটি সরকারের মুখপাত্র হিসাবে কাজ করে এবং যাদের কোথাও জবাবদিহি করার দায় নেই। ওরবান চরম প্রতিক্রিয়াশীল একটি সংবিধানও প্রণয়ন করেছেন এবং নতুন আইন কানুন চালু করে গোটা দেশের ওপর নিজের কর্তৃত্ব কায়েম করেছেন। এই অবস্থায় দেশের মানুষের ক্ষোভের আগুনে নতুন করে জ্বালানির জোগান দিয়েছে এই স্লেভ ল।

আইনটি পাশ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে শুধু রাজপথে নয়, সংসদের ভিতরেও প্রতিবাদ উঠেছে। সাইরেন ও হুইসল বাজিয়ে প্রতিবাদ জানান বিরোধীরা। হাঙ্গেরি আগে ছিল সমাজতান্ত্রিক দেশ। ব্যক্তিস্বাধীনতা ও গণতন্ত্র নেই— এই অপপ্রচারে বিভ্রান্ত মানুষ প্রতিক্রিয়াশীলদের ফাঁদে পা দিয়ে '৯০-এর দশকে সমাজতন্ত্র উচ্ছেদ করেন। পুঁজিবাদী নতুন হাঙ্গেরি কী বিপুল স্বাধীনতা ও গণতান্ত্রিক অধিকার তাঁদের জন্য নিয়ে এসেছে, দেশের মানুষ এখন তা হাড়ে হাড়ে টের পাচ্ছে।

শাসকের চেনা ঢঙে স্লেভ ল-এর বিরুদ্ধে জনবিক্ষোভকে এক ফুঁয়ে উড়িয়ে দিয়েছেন ওরবান। বলেছেন, এ সবই নাকি বিরোধীদের ষড়যন্ত্র। একটি টেলিভিশন চ্যানেলকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে হাঙ্গেরি সরকারের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে, স্লেভ ল নাকি তৈরি হয়েছে শ্রমিক-কর্মচারীদের স্বার্থ রক্ষা করতেই। এভাবেই মিথ্যা প্রচার করে এবং দরিদ্র পরিবারগুলিকে দেওয়া ভরতুকি বন্ধের ভয় দেখিয়ে, কিংবা দেশের অর্থনীতিতে ধস নামার আতঙ্ক ছড়িয়ে বিক্ষোভ দমন করতেই অভ্যস্ত ওরবান সরকার। কিন্তু এবারের বিক্ষোভের তীব্রতা অনেক বেশি।

বুদাপেস্টের পাশাপাশি ১৬ ডিসেম্বর দেশের অন্য শহরগুলিতেও পথে নেমেছিলেন হাঙ্গেরির সাধারণ মানুষ। শ্রমিক-কর্মচারীদের সাথে যোগ দিয়েছিলেন ছাত্রছাত্রীরাও। স্লেভ ল প্রত্যাহার করা না হলে আগামী দিনে ধর্মঘট ডাকার হুঁশিয়ারি দিয়েছে হাঙ্গেরির ট্রেড ইউনিয়নগুলি। এই আন্দোলনকে সফল করার জন্য হাঙ্গেরিতে এখন দরকার শ্রমিক শ্রেণির একটি যথার্থ নেতৃত্বের, যারা শ্রমিক শ্রেণির স্বার্থরক্ষার বিষয়টি নিয়ে কোনও আপস করবে না।

ফালাকাটায় বিদ্যুৎ গ্রাহকদের অবস্থান

বিদ্যুৎ মাশুল ৫০ শতাংশ কমানো ও বিদ্যুৎ আইন সংশোধনী ২০১৮ বাতিলের দাবিতে বিদ্যুৎ গ্রাহকরা ৪ জানুয়ারি ফালাকাটা নতুন চৌপথীতে বিক্ষোভ অবস্থান করেন। বক্তব্য রাখেন অ্যাবেকার রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য সুব্রত বিশ্বাস, কোচবিহার জেলা সম্পাদক কাজল চক্রবর্তী, জলপাইগুড়ি জেলা সম্পাদক অমল রায়, আলিপুরদুয়ার জেলা ইনচার্জ পীযূষকান্তি শর্মা, ফালাকাটা সাপ্লাই সম্পাদক সুদর্শন আইচ প্রমুখ। সভা পরিচালনা করেন ফালাকাটা সাপ্লাই সভাপতি সিতাংশুকুমার দে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, ৫ জানুয়ারি আলিপুরদুয়ার দুর্গাবাড়িতে গ্রাহক সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। বক্তব্য রাখেন সুব্রত বিশ্বাস ও পীযূষকান্তি শর্মা। সভা পরিচালনা করেন আলিপুরদুয়ার নিউটাউন ও পুরনো বাজার সাপ্লাই কমিটির সভাপতি মদনগোপাল সাহা।

মিথিলা বিশ্ববিদ্যালয়ে ডিএসও-র বিক্ষোভ

বিহারের মিথিলা বিশ্ববিদ্যালয়ে এমএ দ্বিতীয় সেমেস্টারের উত্তরপত্র মূল্যায়নে অবহেলার প্রতিবাদে ৪ জানুয়ারি বিক্ষোভ-মিছিল ও ছাত্র সমাবেশ করে অল ইন্ডিয়া ডিএসও। নরগৌনা থেকে মিছিল করে ছাত্রছাত্রীরা বিশ্ববিদ্যালয়ের মূল ভবনের সামনে উপস্থিত হয়। সেখানে বক্তব্য রাখেন ডিএসও-র সভাপতি লাল কুমার। তিনি বলেন, বিশ্ববিদ্যালয়ে বারবার রেজাল্ট বিপর্যয় ঘটছে। এর ফলে বহু ছাত্রের শিক্ষাজীবন নষ্ট হয়ে গেছে। এর সাথে সেমেস্টার প্রথার সামগ্রিক ক্ষতিকারক দিকগুলির প্রতিও তিনি ছাত্রছাত্রীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। ৫ সদস্যের এক প্রতিনিধি দল অধ্যক্ষের কাছে ৬ দফা দাবিপত্র পেশ করেন। দ্রুত এই সমস্যাগুলির সমাধান করা হবে বলে আশ্বাস দেন অধ্যক্ষ।

কাটোয়ায় কৃষক-খেতমজুর সভা

৬ জানুয়ারি কাটোয়া মহকুমার মঙ্গলকোট থানার পালিশগ্রামে এ আই কে কে এম এসের উদ্যোগে কৃষক ও খেতমজুরদের জীবনের নানা সমস্যা নিয়ে ৫০ জনের উপস্থিতিতে আলোচনাসভা হয়। সভায় উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের রাজ্য কমিটির সদস্য কমরেড স্বপন দেবনাথ, দোনা গোস্বামী এবং এস ইউ সি আই (সি)-র পূর্ব বর্ধমান জেলা সম্পাদক কমরেড অনিরুদ্ধ কুণ্ডু।

শেষে কমরেড মনসা মেটেকে ইনচার্জ করে ৯ জনের জেলা প্রস্তুতি কমিটি গঠিত হয়।

হাসপাতাল উন্নয়নের দাবিতে আন্দোলন কোলাঘাটে

পূর্ব মেদিনীপুর জেলার কোলাঘাট ব্লকের বিস্তীর্ণ এলাকার মানুষ পাইকপাড়ী গ্রামীণ হাসপাতাল, নন্দাইগাজন ও মাছিনান স্বাস্থ্যকেন্দ্রের উপর নির্ভরশীল। এই তিনটি কেন্দ্র ব্লকের তিন প্রান্তে অবস্থিত। পাইকপাড়ী গ্রামীণ হাসপাতালটি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলেও তা ব্লকের এমন প্রান্তিক জায়গায় অবস্থিত যে ব্লকের দূরবর্তী স্থান থেকে পৌঁছানোই কষ্টকর। তার উপর ডাক্তার, নার্স, ফার্মাসিস্ট থেকে সাফাইকর্মী সব কিছুরই চূড়ান্ত অভাব।

মাছিনান স্বাস্থ্যকেন্দ্রে ইনডোর বন্ধ, ডাক্তারও রোজ আসেন না, নন্দাইগাজন স্বাস্থ্যকেন্দ্রে রোগী নিয়ে গাড়ি করে পৌঁছানোর মতো রাস্তাই নেই। এই পরিস্থিতিতে কোলাঘাট ব্লক 'হাসপাতাল ও জনস্বাস্থ্য রক্ষা কমিটি' আন্দোলনে নেমেছে। ২৯ ডিসেম্বর কমিটির পক্ষ থেকে বি এম ও এইচকে স্মারকলিপি দেওয়া হয়। তিনি সব দাবির যৌক্তিকতা মেনে নিয়ে জানুয়ারি মাসের মধ্যে মাছিনান স্বাস্থ্যকেন্দ্রে ডাক্তার নিয়োগের প্রতিশ্রুতি দেন।

পাঠকের মতামত

হারিয়ে গেল দু'হাজার স্কুল

ফেল করলেও পাশ, সামান্য বকাঝকাও বন্ধ, অপরাধ করলেও শাস্তি নয়। সরকার ছাত্রদের উপর চাপ কমানোর নামে এ রকম যত ব্যবস্থা গ্রহণ করছে ততই অভিভাবকরা তাঁদের সন্তানদের সরকারি বিদ্যালয় থেকে সরিয়ে বেসরকারি বিদ্যালয়ে ভর্তি করছেন। কঠোর অনুশীলন বা বিদ্যাভ্যাসের মধ্যেই যে ছাত্রদের শিক্ষার উন্নতি হয় তা অভিভাবকরা বেশ উপলব্ধি করেছেন। পাশ-ফেল প্রথা তুলে দিয়ে শিক্ষা ব্যবস্থার যে অতি সরলীকরণ করা হয়েছে তাতে সাধারণ ছাত্র-ছাত্রীদের শিক্ষার মান তলানিতে পৌঁছে গিয়েছে। ফলে সরকারি বিদ্যালয়গুলির ছাত্রসংখ্যা হু হু করে কমছে। মানুষ বাধ্য হয়ে তার সন্তানকে ভর্তি করছে বেসরকারি স্কুলে।

শিক্ষা এখন নামমাত্র সর্বজনীন। আর পাঁচটা পণ্যের জায়গায় তাকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। সর্বজনীন সরকারি শিক্ষা ব্যবস্থা তার গুণগতমান ক্রমশ হারাচ্ছে। বিদ্যাসাগর শিক্ষার ব্যাপক প্রসার (গণশিক্ষা) চেয়েছিলেন ঠিকই, কিন্তু কখনওই তিনি গুণগত মানকে বাদ দিয়ে নামমাত্র শিক্ষার প্রসার চাননি। গণশিক্ষার নামে সরকার কৌশলে মানুষকে বাধ্য করছে বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের দিকে ঠেলে দিতে। এর ফলে সরকারি উদ্যোগে নতুন নতুন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা তো দূরের কথা যে সব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলি সরকারি সাহায্যে চলে আসছে সেগুলিও বন্ধের দিকে ঠেলে দেওয়া হচ্ছে। ইতিমধ্যেই কলকাতার মতো শহরে প্রায় দু'হাজারের বেশি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় ছাত্রাভাবে বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। একইভাবে মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলির অবস্থাও ঠিক সেই দিক নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। এর ফলে সরকারকে যে নতুন নতুন বিদ্যালয় গড়ে তুলতে হত বা শিক্ষক নিয়োগ করে অর্থ ব্যয় করতে হত তা আর করতে হল না। মানুষকে এবার হাজার, লক্ষ টাকা দিয়ে শিক্ষা কিনে নিতে হবে।

দেশে 'সকলের জন্য শিক্ষা' দেওয়ার রীতিকে সুকৌশলে তুলে দিয়ে 'অর্থ যার শিক্ষা তার'-এই জায়গায় নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। গুণগত মান বর্জিত নামমাত্র শিক্ষা দিয়ে বিদ্যালয় স্তর পর্যন্ত ছাত্রছাত্রীদের শিক্ষাকে আটকে দেওয়ার ব্যবস্থা হয়েছে। উচ্চশিক্ষা ক্রমাগত সাধারণ ছাত্রছাত্রীদের নাগালের বাইরে চলে যাচ্ছে। উচ্চ শিক্ষার যে কোনও ডিগ্রি আজ আর লক্ষ টাকার নিচে পাওয়া যায় না।

এভাবেই শিক্ষার দায়ভার আমাদের দেশের কর্ণধারেরা ধীরে ধীরে ঝেড়ে ফেলতে চাইছে। বেসরকারি মালিকদের হাতে শিক্ষা আজ মহার্ঘ পণ্যে পরিণত হচ্ছে। অদূর ভবিষ্যতে সাধারণ বাড়ির সন্তানদের জন্য আর কোনও সরকারি বিদ্যালয় অবশিষ্ট থাকবে না, যেখানে ছাত্রছাত্রীরা অবাধে 'সূর্যের কিরণের মতো' বা 'বৃষ্টির ধারার মতো' সমানভাবে শিক্ষা পাবে।

কিংকর অধিকারী,
বালিচক, পশ্চিম মেদিনীপুর

পাশ-ফেল

তিনি ছিলেন প্রধান শিক্ষক তল্লাটে একমাত্র,
আমি এবং আরও অনেক ছিলাম তাঁর ছাত্র।
তখন ছিল 'স্নাতক' ছাত্র দেখতে পাওয়া ভার,
'সাম্মানিক' ডিগ্রিটিও সঙ্গে ছিল তাঁর।

বাহুল্য ছিল না তাঁর প্রাত্যহিক বেশে,
ছাত্রদের বলতেন তিনি ডেকে হেসে হেসে,
"মাত্র একবার পরীক্ষাতে ফেল করেছ তুমি,
এই দেখো না তিন-তিনবার ফেল করেছি আমি,
মনে রেখো ফেলিওর ইজ দি পিলার অফ সাকসেস",
আজও আমার কানে বাজে সেই কথারই রেশ।

জেনে রেখো পাশ ও ফেল দুটোই খুব দামি,
আমার সারা জীবন ধরে তাই শিখেছি আমি।
কোনও সরকার এই কথাটি আজ তোলে না কানে,
আমরা যেন ভুলে না যাই এই কথাটির মানে।

অনাদিপ্রসাদ মাজী,
অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক, ঝাঁপড়া, পুরুলিয়া

৩০ জানুয়ারি মহামিছিলে সামিল হোন

একের পাতার পর

মানুষ। উৎপাদন যতই কমুক একচেটিয়া মালিকদের মুনাফার পাহাড় এতটুকুও টোল খাবে না। কিন্তু নতুন করে ছাঁটাই হবেন লক্ষ লক্ষ শ্রমিক। নতুন করে ঝাঁপ বন্ধ হবে বেশ কিছু কলকারখানার। তার শ্রমিকরা কিছুদিন কারখানার দেওয়ালের আশেপাশে দীর্ঘশ্বাস ফেলে ঘুরে বেড়িয়ে অবশেষে অভাবের জ্বালায় প্রথমে ঘটিবাটি বন্ধক দেবেন, তাঁদের ঘরের মেয়েরা অভাবের জ্বালায় নিজের মাংস বেচতে বাজারে লাইন দেবে। বন্ধ চা বাগান শ্রমিকের ঘরের মেয়ে থেকে শিশুরা পর্যন্ত বিক্রি হয়ে যাবে মানুষরূপী পশুদের লালসার বাজারে। তারপর— এতেও যখন কুলোবে না, শেষ আশ্রয় হবে রেললাইনে গলা দেওয়া, না হলে গলায় দড়ি দিয়ে ঝুলে পড়া! ভোটের কারবারিরাও তাদের নিয়ে খানিকটা চোখের জল ফেলে একে অপরের বিরুদ্ধে তোপ দাগবেন। কিন্তু ভোটে যারাই জিতুক বন্ধ কারখানার-কাজ হারানো ওই সমস্ত শ্রমিকের কোন উপকারটি হবে?

কী কেন্দ্র, কী রাজ্য কোনও সরকারই প্রতিশ্রুতির ফোয়ারায় কিছু কম যায় না। এই মোদি সাহেব বছরে দু'কোটি বেকারের চাকরি দিয়ে ফেলছেন, তো রাজ্যের তৃণমূল সরকার এককোটি চাকরি দিয়েই ছাড়ছেন। অথচ দিনে দিনে কমছে স্থায়ী কাজের সুযোগ, চাকরি নতুন হবে কি যারা কাজ করছিল তাদের কাজ চলে যাচ্ছে। প্রতিদিন বাড়ছে বেকার সংখ্যা। কেন্দ্রীয় সরকারের নানা দপ্তর, রেল থেকে শুরু করে রাজ্যের সরকারি চাকরিতে অসংখ্য পদ খালি। অথচ উভয় সরকারই সরকারি চাকরিতে নিয়োগ প্রায় বন্ধই করে দিয়েছে। সামান্য যা নিয়োগ হচ্ছে তাও অস্থায়ী ক্যাজুয়াল কিংবা ঠিকা হিসাবে। সরকারি কাজ আউটসোর্সিংয়ের মাধ্যমে বেসরকারি কোম্পানিকে দিয়ে করিয়ে নেওয়াটাই রেওয়াজে দাঁড়িয়েছে। শিক্ষিত বেকার যুবক-যুবতীরাও সরকার ঘোষিত ন্যূনতম মজুরি দূরে থাক সামান্য কিছু টাকার বিনিময়ে হাড়ভাঙা পরিশ্রমে দিনে দিনে ক্ষয়ের দিকে এগিয়ে চলতে বাধ্য হচ্ছেন। আশা-অঙ্গনওয়াড়ি-আইসিডিএস কর্মীরা সারা বছর কাজ করে পরিবার প্রতিপালন দূরে থাক, একজনের পেট চলার মতো ভাতাটুকুও পাচ্ছেন না। একসময় বেকার যুবক-যুবতীদের সামান্য কিছু বেকারভাতা ভিক্ষার মতো ছুঁড়েও সরকার দিত, এখন সেটুকুও বন্ধ। এইসব খেটে খাওয়া মানুষের দাবি কি ভোটের বাক্সে কোনও দিন সমাধান হয়েছে? নাকি আদায় যা হয়েছে আন্দোলনের ময়দানেই।

ভোটের গন্ধে কৃষক দরদে যেন জোয়ার এসেছে দেশ জুড়েই। তাতে কংগ্রেস-বিজেপি-তৃণমূল কেউ কম যায় না। অথচ কৃষকদের ফসলের ন্যায্য দাম কোথায়? দেশ জুড়েই এখন ধান উঠেছে, একই সাথে উঠছে সবজি-ডাল-পেঁয়াজ এমন কত ফসল। আগে ছড়ায়-কবিতায় এই পৌষে চাষির মুখের হাসির কত না ছবি আঁকা হত! অথচ ঠিক এই সময়টাতেই আজ ভারতের হাজার হাজার চাষি পরিবারে হাহাকার। ফসল বিক্রি করে তাঁদের খরচটুকুও উঠছে না। বিজেপি শাসিত মহারাষ্ট্রের পেঁয়াজ চাষি, অন্ধ্র-তেলেঙ্গানা-তামিলনাড়ুর ধানচাষি, উত্তরপ্রদেশ-পাঞ্জাবের আখচাষি, হরিয়ানার গমচাষি যেমন সর্বনাশের দোরগোড়ায়, সারা দেশেই চলছে চাষির আত্মহত্যার মিছিল। একইভাবে পশ্চিমবঙ্গের ধানচাষিরাও লাভজনক মূল্য দূরে থাক, সরকারি সহায়ক মূল্যটুকুও পাচ্ছে না। সরকার নিজেই রেডিও-টিভিতে বিজ্ঞাপন দিয়ে স্বীকার করছে চাষিদের নাম করে এই দাম লুটে নিয়ে যাচ্ছে মধ্যসত্ত্বভোগী ফড়ে-মহাজনরা। সরকার ধানকল মালিকদের উদ্দেশে মাঝে মাঝে কাগুজে হুঙ্কার ছাড়ছে, চাষির থেকে ধান কেনার লক্ষমাত্রার কাছাকাছি পৌঁছানোর জন্যও তাদের কোনও সদিচ্ছা আছে বলে বোঝা যাচ্ছে না। ফলে বড় বড় ধানকল মালিক, খাদ্যশস্য ব্যবসায় টাকা ঢালা বড় বড় পুঁজিমালিকদের কারসাজিতে খোলাবাজারে চালের দাম কমার বদলে বাড়ে। অন্যদিকে চাষি ফসলের দাম না পেয়ে আত্মহত্যা করেই জ্বালা জুড়োতে বাধ্য হয়। রাজ্য সরকার নাকি আত্মঘাতী চাষির পরিবারকে ২ লক্ষ টাকা দেবে। অথচ চাষির চাষের খরচ যাতে কমে, সার-বীজ, কীটনাশক, ট্রাক্টরের যন্ত্রাংশ নিয়ে বহুজাতিক কোম্পানিগুলি চাষিদের যেভাবে শোষণ করে তার বিরুদ্ধে সরকার ব্যবস্থা নিলে চাষিকে আত্মঘাতী হত না। সরকার চাষিকে সেচের পাম্পের জন্য ডিজেল কিংবা বিদ্যুৎ সস্তায় দেওয়ার বন্দোবস্ত করলে, পরিকল্পনা মাফিক খাল কাটলে চাষির জীবন বাঁচত। সে কাজ সরকার করল না।

চাষিকে ফসলের ন্যায্য দাম পাইয়ে দেবে কে? ঋণমকুবের মিথ্যা ফানুস দেখিয়ে চাষিকে আরও যারা ঋণের জালে জড়াতে চায় তারা? একচেটিয়া মালিকদের হাতে কৃষিপণ্যের পুরো বাজারটাকে যারা খুলে দিতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ তারা? কোনও ভোটবাজ দল কি কোনও দিন চাষির চোখের জল মুছিয়েছে? নাকি চাষিকেই দাবি আদায় করতে হয় সংঘবদ্ধ ভাবে! এসেছে সেই বিচারের দিন।

এই পশ্চিমবঙ্গে আজও অনাহারে মানুষ ধুঁকতে ধুঁকতে মরে। ১০০ দিনের কাজের মজুরি মেলে না। হাসপাতালে গেলে মেলে না চিকিৎসা-ওষুধ। অথচ পাড়ায় পাড়ায় মদের স্রোত বইয়ে দেওয়ার আয়োজনে ব্যস্ত রাজ্য সরকার। দরিদ্র সাধারণ পরিবারগুলি ভেসে যাচ্ছে মদের নেশার সর্বনাশা টানে। মদ্যপদের হাতে শিশুকন্যা থেকে শতায়ু বৃদ্ধা কারও রেহাই নেই। অথচ রাজস্বের লোভে ঢালাও মদের প্রসারেই ব্যস্ত সরকার। নারী পাচারে পশ্চিমবঙ্গ শীর্ষ স্থানে আছে। রাজধানী দিল্লি সহ সারা দেশেই প্রতিদিন যেমন ধর্ষণ থেকে খুন চলছে, পশ্চিমবঙ্গও তার ব্যতিক্রম নয়। অথচ বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই দুষ্কৃতীদের সাজা দেওয়ার কোনও ব্যবস্থা নেই। সব মিলিয়ে চলছে এক শ্বাসরোধকর পরিস্থিতি।

সিপিএম সরকার তাদের আমলে চতুর্থ শ্রেণি পর্যন্ত ইংরেজি এবং পাশ-ফেল প্রথা তুলে দিয়ে একটা বিরাট প্রজন্মের কোটি কোটি ছাত্রছাত্রীর অপূরণীয় ক্ষতি করে গেছে। তৃণমূল ২০১১-তে ক্ষমতায় এসেই কেন্দ্রীয় কংগ্রেস সরকারের করা আইনের দোহাই দিয়ে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত পাশ-ফেল তুলে দিয়ে সেই ক্ষতিকে আরও বহুগুণ বাড়িয়েছে। সারা দেশেই এর বিরুদ্ধে আন্দোলন হয়েছে। অবশেষে কেন্দ্রীয় সরকার জনমতের চাপে পাশ-ফেল ফেরানোর কথা কিছুটা হলেও মানতে বাধ্য হয়েছে। ২০১৭ সালের ১৭ জুলাই ডাকা ধর্মঘটের সামনে দাঁড়িয়ে রাজ্য সরকার এ বিষয়ে লিখিত প্রতিশ্রুতি দিতেও বাধ্য হয়ে ছিল। কিন্তু আজও তারা এ নিয়ে কেন্দ্রের দোষ দিয়ে টালবাহানা করে চলেছে। এই একটি নীতিতে কোটি কোটি সাধারণ ঘরের ছাত্রছাত্রীর ভবিষ্যৎ নষ্ট হয়ে গেছে, রাজ্যের বহু বাংলা বা হিন্দি মাধ্যম সাধারণ স্কুলগুলি উঠে যাওয়ার দশায় পৌঁছেছে। স্কুলস্তর থেকেই শিক্ষা প্রায় পুরোপুরি বেসরকারি হাতে চলে গেছে। শিক্ষা নিয়ে ব্যবসার পথ খুলে রাখতেই কি সরকারের এই কালক্ষেপ! এই প্রশ্ন উঠেছে জনমনে। আজ দাবি উঠেছে একটি দিনও বিলম্ব নয় সরকার এখনই ঘোষণা করুক প্রথম শ্রেণি থেকেই পাশ- ফেল ফিরিয়ে আনা হবে।

চাষি, শ্রমিক, মধ্যবিত্ত, খেটেখাওয়া সব স্তরের মানুষের এই জ্বলন্ত দাবিগুলি নিয়ে আজ দরকার তীব্র আন্দোলনের জোয়ার তোলা দেশ জুড়ে। বিজেপি এবং কংগ্রেসের একচেটিয়া মালিকদের নির্লজ্জ সেবার নীতির বিরুদ্ধে বামগণতান্ত্রিক শক্তিগুলি ঐক্যবদ্ধ হয়ে আন্দোলনে নামবে এটাই ছিল আজ সময়ের দাবি। অথচ ভোটের বাদ্যি বাজতেই তথাকথিত বৃহৎ বামপন্থীরা হিসাব করতে বসেছে কী করে কিছু সিট বাগিয়ে নেওয়া যায়। তার জন্য কংগ্রেস কিংবা জাতপাতবাদী নানা দলের সাথে যে কোনও শর্তে আপসেও তারা রাজি। আশার কথা নানা কিছুর মধ্য দিয়ে মানুষ আজ বুঝছে আন্দোলনই পথ, শুধুমাত্র সরকার বদলের খোয়াব দেখে তার কোনও সমস্যার সমাধান হবে না। আন্দোলন বারেবারে মাথাচাড়া দিতে চাইছে। মধ্যপ্রদেশের কৃষক আন্দোলন, মহারাষ্ট্রের কৃষক আন্দোলন তো এই সত্যকেই দেখিয়ে দিয়েছে। অথচ এস ইউ সি আই (সি) ছাড়া সব দল ব্যস্ত এই ক্ষোভকে আবার ভোটের বাক্সে পুরে ঠাণ্ডা ঘরে জমা করতে।

তাই ডাক এসেছে আন্দোলনের। এসেছে ৩০ জানুয়ারি মেহনতি শ্রমিক-কৃষক-মধ্যবিত্ত সকল স্তরের মানুষের বজ্র নির্ঘোষে তোলা দাবিকে দরিদ্রের কুটির, শ্রমিকের কারখানায়, কৃষকের খেতে, ছাত্রদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সহ সর্বত্র পৌঁছে দেওয়ার ডাক। এ ডাকে সাড়া দিয়ে এগিয়ে আসছেন হাজার হাজার মানুষ। তাঁরা পা মেলাবেন হেদুয়া পার্ক থেকে এসপ্ল্যানেড পর্যন্ত মহামিছিলে।

গো-রক্ষার নামে বিজেপির জুলুমে বিপদে পড়েছেন চাষিরা

স্কুলে, কলেজে, স্বাস্থ্যকেন্দ্রের ঘর ভর্তি গরুতে! হাসির বিষয় নয়, উত্তরপ্রদেশে বিজেপি সরকারের গো-রক্ষার জুলুমের সামনে মরিয়া হয়ে চাষিরা তাদের ফসল বাঁচাতে কয়েক হাজার গরু-বাছুরকে এমনভাবেই ঢুকিয়ে দিয়ে যাচ্ছেন সরকারি অফিসে, স্কুলে।

বিজেপির মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথের রাজত্বে সাধারণ মানুষ তো কোন ছার, গো-রক্ষকরা পুলিশ অফিসারকে পিটিয়ে মারলেও সরকার নড়ে বসে না। মুখ্যমন্ত্রী পর্যন্ত অক্লেশে বলে দেন, ইনস্পেক্টর সুবোধ সিংহের হত্যা একটা সামান্য দুর্ঘটনা। সরকার গো-রক্ষা নিয়ে বেশি চিন্তিত। এর আগে রাজস্থান, গুজরাট, উত্তরপ্রদেশ, বিহার, ঝাড়খণ্ডে বিজেপি-আরএসএসের মদতপুষ্ট গো-রক্ষা বাহিনীর তাণ্ডবে প্রাণ গেছে বেশ কয়েকজন দুধ ব্যবসায়ী ও সাধারণ চাষির। ঘরে গরুর মাংস রাখার গুজব ছড়িয়ে দিল্লির উপকণ্ঠে পরিকল্পিত গণপিটুনিতে প্রাণ কেড়ে নেওয়া হয়েছে মহম্মদ আখলাকের। কিছুদিন আগে রাজস্থানে গো-সন্তানদের গণপিটুনিতে দুধ ব্যবসায়ী আকবর খানের মৃত্যুর পর সামনে এসেছিল এক সাংঘাতিক সত্য।

রাজস্থান, হরিয়ানা, উত্তরপ্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ, মহারাষ্ট্র কিংবা গুজরাটের মতো রাজ্যগুলিতে আরএসএস-বিজেপি-বিশ্বহিন্দু পরিষদ-বজরঙ্গ দলের মতো হিন্দুত্বের স্বঘোষিত অভিভাবক দলের নেতারা ‘গো-রক্ষা’র নামে লক্ষ লক্ষ টাকা কামিয়েছেন ক্ষমতায় থাকার সময়। শুধু রাজস্থানের আলোয়ারেই এদের পরিচালনায় বেশ কয়েকটি ‘গোশালা’ চালু হয়েছে। হিন্দু মুসলমান নির্বিশেষে যে কেউ রাজস্থানের হাট থেকে গরু, ছাগল, ভেড়া, উট যে কোনও পশুই কিনুক না কেন এই বাহিনীকে তোলা না দিয়ে তাদের উপায় নেই। টাকা আদায়ের জন্য এরা চালু করেছে ‘চেকপোস্ট’ যেখানে স্থানীয় থানার পুলিশও গো-রক্ষক বাহিনীর সাথে বখরার ভিত্তিতে পাহারা দেয়। পশু কিনে কেউ রাস্তা দিয়ে হেঁটে বা গাড়িতে গেলেই এরা ঝাঁপিয়ে পড়ে। টাকা না পেলে কেড়ে নেয় গরু ভেড়া যা পায়। এমনকী গো-রক্ষার ধুয়ো তুলে নানা গ্রামে হানা দিয়ে গোরু কেড়ে আনে ওরা। টাকা দিয়ে ছাড়াতে পারে না যারা, তাদের পশুগুলিকে আবার বিক্রি করে দেয় এই ‘গো-রক্ষকরা’। এদের হাতে পশুপালক উপজাতিদেরও ছাড় নেই। ধর্মে হিন্দু ‘রাবারি’ উপজাতির মানুষরা গুজরাট থেকে হাঁটাপথে রাজস্থান এসে পশু কিনে আবার গুজরাটে ফিরে যান। বহুকাল ধরে তাঁদের এই জীবিকা চলছে। কিন্তু কয়েকবছর ধরে আলোয়ার পার হওয়ার সময় ‘গো-রক্ষা চেকপোস্টে’ তোলা না দিলে জোটে মারধোর। জোর করে টাকা কেড়ে নেওয়াটা গো-রক্ষকদের কাছে তো জলভাত। আকবর খানের মৃত্যুর পর রাবারি উপজাতির এক মোড়ল সাংবাদিকদের বলেছিলেন, বাঁচতে গেলে ওদের টাকা না দিয়ে উপায় নেই (দ্য টেলিগ্রাফ ২৪ জুলাই, ২০১৮)।

উত্তরপ্রদেশে বিজেপি সরকার সমস্ত আইনি-বেআইনি কসাইখানা বন্ধ করে দেওয়ায় এবং কেন্দ্রীয় বিজেপি সরকার গবাদি পশুর ব্যবসা নিয়ন্ত্রণের আইন আনার পর থেকে উত্তরপ্রদেশের কৃষকরা এক মারাত্মক সংকটে পড়েছেন। বর্তমানে মেশিন-ট্রাক্টরের প্রচলন এতটাই বেড়েছে যে, চাষের কাজে গরু মোষের ব্যবহার প্রায় নেই। দুধ উৎপাদনের বয়স পেরিয়ে যাওয়ার পর কৃষকরা তাঁদের উদ্বৃত্ত গোরু-মোষ এতদিন বিক্রি করে দিতে পারতেন। কিন্তু সরকারি আইন এবং বিজেপি মদতপুষ্ট গো-রক্ষকদের মারের ভয়ে তাঁরা গরু মোষ নিয়ে কোথাও যেতে ভয় পাচ্ছেন। এদিকে ঘরে বসিয়ে গরু-মোষকে খাওয়ানোর সামর্থ্য তাঁদের নেই এবং সেটা অর্থনৈতিক দিক দিয়ে নেহাত অলাভজনক। স্বাভাবিক ভাবেই তারা গরু ছেড়ে দিচ্ছেন। ফলে বেওয়ারিশ গবাদি পশুর সংখ্যা লাফিয়ে লাফিয়ে বেড়ে চলেছে। তারা রাস্তাঘাটে দুর্ঘটনার কারণ হচ্ছে, চাষিদের ফসল খেয়ে নষ্ট করছে। চাষিরা অসহায়, কারণ কাঁটাতারের বেড়া দিয়ে গরু আটকাতে গেলে সেই বেড়ায় যদি কোনও গরুর আঘাত লাগে তাতে গো-রক্ষকদের হাতে চাষি পরিবারের হেনস্থা এমনকী খুন হয়ে যাওয়ারও আশঙ্কা আছে। এদিকে ছেড়ে দেওয়া বেওয়ারিশ গরু ফসল নষ্ট করায় দুই কৃষক পরিবারে খুনোখুনির ঘটনাও ঘটছে। আলিগড়, আগ্রায় মরিয়া চাষিরা বেওয়ারিশ গবাদি পশুর পাল ঠেকাতে অ্যাসিড ছুঁড়েছেন এমন ঘটনাও ঘটছে। বিপন্ন কৃষকরা গরুর পাল তাড়িয়ে নিয়ে গিয়ে সরকারি স্বাস্থ্যকেন্দ্র, প্রাইমারি বা সেকেন্ডারি স্কুলে ঢুকিয়ে গরুর পালকে বন্দি করে রাখছেন। উত্তরপ্রদেশের মথুরায় একটি স্কুলে ৮০০ গরুকে বন্দি করে তাঁরা পুলিশ ডেকেছেন। এমন ঘটনা বহু স্থানে ঘটছে। ক্ষতি হচ্ছে ছাত্রদেরও। বিপদে পড়েছেন ডেয়ারি চাষিরাও। আগে রাজস্থান-হরিয়ানায় নিয়মিত দুধেল গাইয়ের মেলা হত। তাঁরা সেখান থেকে প্রয়োজন মতো গরু কিনতে পারতেন। এখন গো-রক্ষকদের ভয়ে গরু নিয়ে কেউ রাস্তায় বার হতে পারে না। ফলে মেলাও বন্ধ।

উত্তরপ্রদেশ সরকার গোশালা করার নামে কয়েক হাজার কোটি টাকা বরাদ্দ করছে। গো-রাজনীতির জোয়ারের টানেই বিজেপি ২০১৯-এর ভোট বৈতরণী পার হওয়ার পরিকল্পনা করছে। তাদের গো-রক্ষার ভণ্ডামিতে শুধু চাষিরা মরছেন তাই নয়, গবাদি পশুগুলিও চূড়ান্ত কষ্টে পড়ছে। রাজস্থান, মহারাষ্ট্র, হরিয়ানায় সম্প্রতি গোশালার অব্যবস্থায়, খাদ্য-জলের অভাবে প্রাণ হারিয়েছে কয়েক হাজার গবাদি পশু। তাতে বিজেপির কিছু আসে যায় না। তারা হিসাব করছে মানুষের ধর্মবিশ্বাসকে ভোটব্যাঙ্কের পকেটে পুরতে।

ভোটব্যাঙ্ক হারানোর আশঙ্কায় কংগ্রেস এই গো-রাজনীতির বিরুদ্ধে কোনও কথা বলা দূরে থাক, হিন্দুত্ববাদী রাজনীতির পালেই হাওয়া লাগাচ্ছে। কংগ্রেস সভাপতি মন্দিরে মন্দিরে পৈতে দেখিয়ে বেড়াচ্ছেন। বিজেপি-কংগ্রেস উভয়েরই নীতিহীন ভ্রষ্ট রাজনীতির শিকার হচ্ছেন ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সাধারণ কৃষক— যাঁরা গবাদি পশুকে নিয়ে প্রজন্মের পর প্রজন্ম দিন কাটিয়েছেন, তাদের ব্যবহার করেছেন, যত্ন করেছেন, আবার প্রয়োজনে বিক্রি করে দিয়েছেন। তাতে গরুর সংখ্যা কমেনি শুধু নয়, নিজের প্রয়োজনেই মানুষ গবাদি পশুর উন্নতিতে মন দিয়েছে। সাম্প্রদায়িক ভোটব্যাঙ্কের রাজনীতি এই স্বাভাবিক প্রক্রিয়াকে ব্যাহত করায় কৃষকের স্বাভাবিক জীবনযাপনেই সংকট নেমে এসেছে। সাম্প্রদায়িক সুড়সুড়ির সস্তা রাজনীতির চমক যে সমাজের কী মারাত্মক ক্ষতি করে, এ তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ।

কংগ্রেস যদি ‘সেকুলার’ আরএসএস বন্ধু হয় কী করে!

কংগ্রেস যে আদৌ ধর্মনিরপেক্ষ নয়, তা ‘গণদাবী’র পাতায় বহুবার প্রমাণ সহ তুলে ধরা হয়েছে। তবুও যাঁদের ধন্ধ মেটেনি, তাঁরা পড়ে নিতে পারেন ‘দ্য টেলিগ্রাফ’ সংবাদপত্রের সহকারি সম্পাদক রশিদ কিদওয়াইয়ের ‘ব্যালট— টেন এপিসোডস দ্যাট শেপড ইন্ডিয়াজ ডেমোক্রেসি’ বইটি। এতে তিনি দেখিয়েছেন, বাবরি মসজিদ ভাঙা, রামমন্দির তৈরির খেলা ও তাকে কেন্দ্র করে যে কদর্য রাজনীতি এ দেশে চলছে তার প্রধান হোতা কংগ্রেস।

কংগ্রেস ১৯৮৪ সালের লোকসভা নির্বাচন সম্পূর্ণ ‘হিন্দু তাস’-এর ভিত্তিতে পরিচালনা করেছিল। একজন শিখ রক্ষীর গুলিতে ইন্দিরা গান্ধী হত্যার অব্যবহিত পরে ওই ভোট অনুষ্ঠিত হয়েছিল। দেশ জুড়ে তখন কংগ্রেস নেতাদের প্রত্যক্ষ মদতে শিখ নিধন চলছিল। ভিন্দ্রানওয়ালে ও তাঁর সশস্ত্র গোষ্ঠীকে অপসারণ করার উদ্দেশ্যে অমৃতসরের স্বর্ণমন্দিরে ‘অপারেশন ব্লু স্টার’ নামে সেনা অভিযান এবং ভিন্দ্রানওয়ালের হত্যার ঘটনা তার আগেই ঘটে যায়। কংগ্রেসের নির্বাচনী প্রচারের ফোকাস ছিল — শিখদের পৃথক ‘হোমল্যান্ড’ চাওয়ার বিরুদ্ধে। ওই বইয়ের তৃতীয় পরিচ্ছেদ “দ্য বিগ ট্রি অ্যান্ড দ্য স্যাপলিং”-এ বলা হয়েছিল, ‘কংগ্রেসের গোপন অ্যাজেন্ডা ছিল হিন্দু মানসিকতায় নিরাপত্তাহীনতার বীজ ঢুকিয়ে রাজীব গান্ধীর নেতৃত্বে কংগ্রেস যে একমাত্র রক্ষাকর্তা হতে পারে তা বুঝিয়ে হিন্দু ভোট নিশ্চিত করা’।

ওই বইতে আরও বলা হয়েছে, ‘নির্বাচনের প্রাক্কালে প্রধানমন্ত্রী পদপ্রার্থী রাজীব গান্ধী কংগ্রেসের পক্ষে আরএসএস-এর সমর্থন চেয়ে নাগপুরের কংগ্রেস এমপি বনোয়ারিলাল পুরোহিতের মাধ্যমে তৎকালীন সরসঙ্ঘচালক বালাসাহেব দেওরসের সঙ্গে গোপনে সাক্ষাৎ করেছিলেন’। আর ওই সমর্থনের বিনিময়ে আরএসএস অযোধ্যায় রামজন্মভূমি শিলান্যাসের অনুমতি চেয়েছিল। সেই নির্বাচনে বিজেপি প্রতিদ্বন্দ্বিতা করা সত্ত্বেও আরএসএস তার পাশে না দাঁড়িয়ে কংগ্রেসকে দু’হাত তুলে সমর্থন করেছিল।

রাজীব গান্ধীর ঘনিষ্ঠ বন্ধু ও কেন্দ্রীয় মন্ত্রী অরুণ নেহেরু এক সাপ্তাহিকীতে সাক্ষাৎকারে বলেছিলেন, “১৯৮৬ সালের প্রথম দিকে ‘মুসলিম কার্ড’ খেলতে সুপ্রিম কোর্টের রায়ের বিরুদ্ধে ‘মুসলিম মহিলা বিল’ পাশ করানো হয়েছিল এবং তারপর ‘হিন্দু কার্ড’ খেলার জন্য অযোধ্যায় বাবরি মসজিদের তালা খোলার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।” তিনি আরও বলেছিলেন, “মসজিদের তালা খোলার দু’দিন পর এক সন্ধ্যায় আমি রাজীব গান্ধীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে যাই। তিনি তখন দূরদর্শনে দেখছিলেন মসজিদের ভিতরে রামলালার পূজা চলছে। আমি তাঁকে জিজ্ঞাসা করলাম, কে এসব জিনিস দূরদর্শনে দেখানোর ব্যবস্থা করেছে? তিনি কোনও উত্তর দেননি, মৃদু মৃদু হাসছিলেন, আর পূজা দেখছিলেন। আমি তারপর উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী বীরবাহাদুর সিংকে চিঠি লিখে জানতে চেয়েছিলাম যে, কে এইসব ব্যবস্থা করেছেন। তিনি উত্তরে জানান, আপনি প্রধানমন্ত্রীকেই জিজ্ঞাসা করুন।”

তারপর ১৯৮৯ সালে লোকসভা নির্বাচনের আগে হিন্দু ভোট আরও নিশ্চিত করতে রাজীব গান্ধী আদালতের নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে বিশ্ব হিন্দু পরিষদকে বাবরি মসজিদের কাছেই রামমন্দিরের শিলান্যাসের অনুমতি দেন। রামমন্দির ইস্যু অতি দ্রুত কংগ্রেসের হাত থেকে সংঘ পরিবারের হাতে চলে যায়। বস্তুত ওই শিলান্যাসই ১৯৯২ সালের বাবরি মসজিদ ভাঙা ও তার পরবর্তী ভয়ঙ্কর সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার বীজ বপন করেছিল।

কংগ্রেসের সঙ্গে আরএসএসের গভীর সম্পর্কের আরও উদাহরণ পাওয়া যায় পশ্চিমবঙ্গ, উত্তরপ্রদেশ ও সিকিমের প্রাক্তন রাজ্যপাল এবং ভারতীয় গোয়েন্দা সংস্থা আইবি-র প্রাক্তন প্রধান টি ভি রাজেশ্বরের বই ‘দ্য ক্রুসিয়াল ইয়ার্স’-এ। ওই বইতে বলা হয়েছে বালাসাহেব দেওরস ইন্দিরা গান্ধী ঘোষিত জরুরি অবস্থার বহু পদক্ষেপের দৃঢ় সমর্থক ছিলেন। রাজেশ্বর বলেছিলেন, “তাঁরা (আরএসএস) জরুরি অবস্থার কেবল সমর্থক ছিলেন তাই নয়, সেই সমর্থন প্রকাশ করার জন্য দেওরস এমনকী ইন্দিরা গান্ধী ও সঞ্জয় গান্ধীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে চেয়েছিলেন”। ওই বইতে বলা হয়েছে, আরএসএস ইন্দিরা গান্ধীকে ভোটের সময় সমর্থন করতে চেয়েছিল এবং তা জানানোর জন্যও সরসঙ্ঘচালকের প্রয়োজন ছিল ইন্দিরা ও সঞ্জয়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ করার।

এই সমস্ত তথ্য থেকে এটা জলের মতো পরিষ্কার যে ইন্দিরা কংগ্রেস তথা কংগ্রেসের সঙ্গে চরম দক্ষিণপন্থী ও সাম্প্রদায়িক শক্তি আরএসএস-এর সম্পর্ক কত সুগভীর ও সুপ্রাচীন। অন্যদিকে আরএসএসের সঙ্গে বিজেপির রসায়ন কারও অজানা নয়। অথচ এই কংগ্রেসের গায়ে গণতান্ত্রিক ও ধর্মনিরপেক্ষ তকমা লাগিয়ে সিপিএম বিজেপির বিরুদ্ধে লড়াইয়ে জোট বাঁধতে উঠে পড়ে লেগেছে!

উত্তর ২৪ পরগণায় শিক্ষা কনভেনশন

অবিলম্বে প্রথম শ্রেণি থেকে পাশ-ফেল চালু ও শিক্ষার নানা দাবিতে ৬ জানুয়ারি বারাসাত সুভাষ ইনস্টিটিউটে উত্তর ২৪ পরগণা জেলা শিক্ষা কনভেনশন অনুষ্ঠিত হয়। শিক্ষক-অভিভাবক ও ছাত্রদের শতাধিক প্রতিনিধির উপস্থিতিতে এই কনভেনশনে সভাপতিত্ব করেন বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ, অধ্যাপক অনাথবন্ধু মুখোপাধ্যায়। প্রধান বক্তা ছিলেন অল বেঙ্গল সেভ এডুকেশন কমিটির সম্পাদক কার্তিক সাহা। পার্থ ভট্টাচার্যকে সভাপতি এবং প্রবোধ সরকারকে সম্পাদক করে জেলা সেভ এডুকেশন কমিটি গঠিত হয়।

R.N.I. No 5268 / 1960
P.R. No. KOL RMS/138/2019-21

কার্ল লিবনেখট ও রোজা লুক্সেমবুর্গ স্মরণে
জার্মানিতে লাল পতাকার মিছিল

জার্মানির কমিউনিস্ট নেতা কার্ল লিবনেখট ও রোজা লুক্সেমবুর্গের ১০০তম মৃত্যুবার্ষিকীতে তাঁদের ছবি নিয়ে ১৩ জানুয়ারি বার্লিনে বামপন্থীদের মিছিল। প্রথম বিশ্বযুদ্ধে উগ্র জাতীয়তাবাদের স্রোতে ভেসে যাওয়া দ্বিতীয় আন্তর্জাতিকের নেতৃবৃন্দের বিরুদ্ধে তীব্র আদর্শগত সংগ্রাম চালান রোজা। কার্ল লিবনেখট ও রোজা যৌথভাবে জার্মানিতে পুরনো শোধনবাদী কমিউনিস্ট পার্টির সঙ্গে বিচ্ছেদ ঘটিয়ে নতুন বিপ্লবী পার্টি গড়ে তোলেন। ১৯১৮ সালে জার্মানিতে বিপ্লবী অভ্যুত্থানের ডাক দেন তাঁরা। সরকার ও রাষ্ট্রের ভাড়াটে ঘাতকরা ১৯১৯ সালের জানুয়ারিতে এই দুই বিপ্লবীকে নৃশংসভাবে হত্যা করে। আজও বিশ্বের দেশে দেশে তাঁদের নাম কমিউনিস্টদের প্রেরণা দেয়। জার্মানির এই মিছিল প্রমাণ করে কমিউনিজমের আদর্শকে শাসক বুর্জোয়ারা ভুলিয়ে দিতে পারেনি, পারবেও না।

মুম্বই বাস শ্রমিকদের লাগাতার ধর্মঘট
সংহতি জানাল এস ইউ সি আই (সি)

৮ জানুয়ারি থেকে লাগাতার ধর্মঘটে নেমেছেন মুম্বইয়ের ৩০ হাজার বাস শ্রমিক। বিজেপি-শিবসেনার রাজ্য সরকার এবং মুম্বই পুরসভা এই ধর্মঘটী বাস শ্রমিকদের ন্যায্য দাবিগুলি নিয়ে আলোচনা করে সমস্যা মেটানোর পরিবর্তে অগণতান্ত্রিক কালা আইন 'মেসমা' (মহারাষ্ট্র এসেন্সিয়াল সার্ভিস মেনটেন্যান্স অ্যাক্ট) জারি করে দমন পীড়নের রাস্তা নিয়েছে।

এই ধর্মঘটের পাশে দাঁড়িয়েছে শ্রমিক সংগঠন এ আই ইউ টি ইউ সি এবং এস ইউ সি আই (সি) দল। ১৩ জানুয়ারি এস ইউ সি আই (সি) মুখ্যমন্ত্রী দেবেন্দ্র ফড়নবিশের কাছে দাবি জানায় বাস শ্রমিকদের ধর্মঘটের উপর বলপ্রয়োগ করা চলবে না। দলের মুম্বই সাংগঠনিক কমিটির সম্পাদক কমরেড অনিল ত্যাগী এক বিবৃতিতে বলেন, 'সরকার, মুম্বই পুরসভা এবং বেস্ট (বৃহন্মুম্বই ইলেকট্রিক সাপ্লাই অ্যান্ড ট্রান্সপোর্ট) কোম্পানির ন্যক্কারজনক মনোভাবই ধর্মঘটী শ্রমিক, তাঁদের পরিবার এবং সাধারণ মানুষের দুর্দশাকে দীর্ঘায়িত করছে।' তিনি বাস শ্রমিকদের সমস্ত দাবি পূরণের জন্য মুখ্যমন্ত্রীর দ্রুত হস্তক্ষেপ দাবি করেন।

মুম্বইয়ের বাস পরিষেবা দেশের অন্যতম শ্রেষ্ঠ গণপরিহণ ব্যবস্থা বলে স্বীকৃত। এই পরিষেবার শ্রমিকরাই আজ সংকটে। ধর্মঘটী শ্রমিকদের দাবি— বৃহন্মুম্বই পুর করপোরেশন এবং বেস্ট কোম্পানির পরিবহণ বাজেট সংযুক্ত করা, বেতন সেটলমেন্ট, ১৪ হাজারের বেশি অস্থায়ী কর্মীর স্থায়ীকরণ, বোনাস এবং আবাসন সমস্যার সমাধান। বেস্ট কোম্পানি বিপুল মুনাফা করলেও বেশিরভাগ বাসকর্মীকে ১২ হাজার টাকার বেশি মাইনে দেওয়া হয় না। বিজেপি-শিবসেনা প্রশাসন বাস সংখ্যা ক্রমাগত কমিয়ে বৃহৎ বহুজাতিক কোম্পানিগুলির পরিবহণ ব্যবসায় সুবিধা করে দিতে চায়। ফলে তারা বেস্ট কোম্পানির ১৮ হাজার কর্মী সংখ্যা কমিয়েছে। অর্থাভাবের অজুহাতে কর্মীদের শোষণ করছে সরকার এবং বেস্ট কর্তৃপক্ষ। অথচ বেসরকারি কনকিয়া কোম্পানির কাছ থেকে বেস্টের পাওনা ৩২০ কোটি টাকা আদায়ে তাদের কোনও উদ্যোগ নেই। এস ইউ সি আই (সি) দাবি করেছে বাস পরিষেবাকে মুনাফার দৃষ্টিতে না দেখে জনস্বার্থে দেখতে হবে এবং মুম্বই বাস শ্রমিকদের সমস্ত ন্যায্য দাবি অবিলম্বে কার্যকর করতে হবে।

সহায়ক মূল্যে ধান কেনার দাবিতে পথ অবরোধ

সহায়ক মূল্যে ধান কেনা সহ বিভিন্ন দাবিতে বাঁকুড়া ডিস্ট্রিক্ট কনট্রোলার সহ বিভিন্ন ব্লকে বিক্ষোভ দেখানো হয়। ১০ জানুয়ারি হিড়বাঁধ ব্লকের হাতিরামপুর বাজারে অল ইন্ডিয়া কিষাণ খেতমজদুর সংগঠনের নেতৃত্বে চাষিরা ধান ফেলে এক ঘণ্টার বেশি সময় ধরে জাতীয় সড়ক অবরোধ করেন। সার-বীজ-কীটনাশক ও কৃষি যন্ত্রপাতির মূল্যবৃদ্ধি রোধ, কৃষি জমির মিউটেশন ফি মকুব এবং গরিব চাষিদের কৃষিঋণ দেওয়ার দাবি জানিয়ে বক্তব্য রাখেন সংগঠনের জেলা সম্পাদক কমরেড তারাশঙ্কর গোপ এবং কমরেডস নরেন্দ্রনাথ কুম্ভকার ও বৈদ্যনাথ মণ্ডল।

৬০০ টাকা ফি কমল আন্দোলনের চাপে

ফি বৃদ্ধির প্রতিবাদে অল ইন্ডিয়া ডিএসও-র নেতৃত্বে কয়েক শত ছাত্র-অভিভাবকের আন্দোলনের চাপে জয়নগরে মজিলপুর শ্যামসুন্দর বালিকা বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ ৫ জানুয়ারি বাড়তি ফি ফেরত দিতে বাধ্য হলেন। পঞ্চম থেকে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত ফি ৯৪০ টাকা থেকে কমিয়ে ৩৪০ টাকা এবং নবম ও দশম শ্রেণিতে ফি ১৩০০ টাকা থেকে কমিয়ে ৭০০ টাকা করা হয়েছে। আন্দোলনের এই জয়ে সংগঠনের পক্ষ থেকে ছাত্র ও অভিভাবকদের সংগ্রামী অভিনন্দন জানানো হয়।

একই ভাবে ফি কমানোর দাবিতে দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলা জুড়ে আন্দোলনের কর্মসূচি নিয়েছে এআইডিএসও।

দক্ষিণ ২৪ পরগণায় নতুন রেল লাইনের দাবিতে
এস ইউ সি আই (সি)-র ডি আর এম ডেপুটেশন

২ জানুয়ারি এস ইউ সি আই (সি) দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলা কমিটির তরফ থেকে শিয়ালদহ ডি আর এম দপ্তরে দাবিপত্র পেশ করা হয়। শিয়ালদহ সাউথ সেকশনের নামখানা, ডায়মন্ডহারবার, ক্যানিং শাখায় ট্রেন বাড়ানো, প্ল্যাটফর্মের উচ্চতা বৃদ্ধি, যাত্রীদের সুযোগ-সুবিধা বাড়ানো এবং জয়নগর মজিলপুর থেকে রায়দীঘি, মৈপীঠ, লক্ষ্মীকান্তপুর থেকে পাথরপ্রতিমা, ক্যানিং থেকে ঝড়খালি ও গদখালি, তালদি থেকে ভোজেরহাট হয়ে শিয়ালদহ পর্যন্ত নতুন ট্রেন চালু করা প্রভৃতি দাবিতে ছিল এই কর্মসূচি। নিউ গড়িয়াকে টার্মিনাল স্টেশন হিসাবে ব্যবহার করে নামখানা, ডায়মন্ডহারবার ও ক্যানিং শাখায় নতুন ট্রেন চালানো প্রভৃতি দাবিও জানানো হয়।

ডি আর এম বলেন, নিউ গড়িয়ার ডিজাইন তাদের ভুল হয়েছিল। তা সংশোধন করে নতুন ট্রেন চালানো যাবে কি না আগামী ২ সপ্তাহের মধ্যে জানাবেন। ১৬টা স্টেশনের ৩২টা প্ল্যাটফর্ম উঁচু করার কাজ ২০১৯-এর মধ্যে করে দেওয়ার আশ্বাস দেন তিনি।

নতুন রেললাইন পাতার বিষয়টি উচ্চতর কর্তৃপক্ষের সঙ্গে কথা বলে জানাবেন। ডেপুটেশনে নেতৃত্ব দেন প্রাক্তন বিধায়ক ও দলের রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য কমরেড তরুণকান্তি নস্কর, রাজ্য কমিটির সদস্য কমরেড অজয় সাহা সহ কমরেডস অম্লান সরকার, নারায়ণ নস্কর, গৌতম মণ্ডল, প্রবীর চক্রবর্তী, বলরাম কয়াল প্রমুখ।

মানিক মুখার্জী কর্তৃক এসইউসিআই(সি) পঃ বঃ রাজ্য কমিটির পক্ষে ৪৮ লেনিন সরণি, কলকাতা-১৩ হইতে প্রকাশিত ও গণদাবী প্রিন্টার্স অ্যান্ড পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ৫২বি ইন্ডিয়ান মিরর স্ট্রিট, কলকাতা-১৩ হইতে মুদ্রিত।
সম্পাদক মানিক মুখার্জী। ফোন ঃ সম্পাদকীয় দপ্তর ঃ ২২৬৫০২৭৬ ম্যানেজারের দপ্তর ঃ ২২৬৫৩২৩৪ ফ্যাক্স ঃ (০৩৩) ২২৬৫০২৭৬, e-mail : ganadabi@gmail.com Website : www.ganadabi.com